Vol. 34 | No. 2 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিষ্ণু দে'র কবি-স্বভাব : মার্কসবাদ প্রসঙ্গ

Volume	34
Issue	2
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বেগম আকতার কামাল
Published online	February 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v34i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v34i2.5
Pages	73-120
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিষ্ণু দে'র কবি–স্বভাব : মার্কসবাদ প্রসঙ্গ

বেগম আকতার কামাল

১৯৩৪ সালে বিষ্ণু দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন এবং ১৯৩৫ সালে শুরু করেন রিপন কলেজে শিক্ষকতা। সেখানে তাঁর প্রিয় শিক্ষক রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ তখন অধ্যক্ষ, সহকর্মী বুদ্ধদেব বসু এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বিষ্ণু দে সম্পর্কে সহকর্মী হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ স্মৃতিচারণ বিষ্ণু দের তখনকার স্বভাব ও সাহিত্যিক প্রতিবেশটির তথ্য তুলে ধরে। তিনি 'তরী হতে তীর'[১] গ্রন্থে লিখেছেন—

> রিপন কলেজে তখন প্রকৃত সমুজ্জ্বল এক সাহিত্যিক পরিবেশ– ছেলে–বেলা থেকে জানা 'বসুমতি সাহিত্য মন্দির' এর বিজ্ঞাপনে ব্যবহৃত 'অষ্টাবক্র সম্মিলন' কথাটি মনে পড়ে যেত বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত (পরে এলেন প্রমথনাথ বিশী ও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতিকে একত্র দেখে!— উনিশ শতকে বাংলার নবজাগৃতি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট এবং কলেজ স্কোয়ারের উত্তরে বইয়ের দোকানে–ভরা গলিতে নামাঙ্কিত শ্যামাচরণ দের বংশধর বিষ্ণু বাবুকে দেখে মনে হ'ত যে বনেদী কলকাতার ধারা বজায় রেখে চলছেন, ধুতিতে কোথাও ভাঁজ পড়েনি, গায়ের 'পাঞ্জাবী' গিলে–করা নয় কিন্তু নিখুঁত ধোপ–দস্ত; দীর্ঘাকৃতি মেদহীন, বুঝি খর্ব সমাজে ভ্রাম্যমাণ বলে একটু ঝুঁকে–থাকা, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ অথচ সদয়, স্মিতানন, স্বল্পবাক, কিন্তু বন্ধু–পরিবেশে আলাপপ্রিয়, ব্যাজোক্তিতে সিদ্ধ, বহুজন বিষয়ে বিস্মৃত তথ্য উদ্ধারে পুলকিত। মনে আছে আমাদের মাষ্টার মশাই নিবারণ বাবু বিষ্ণু বাবুকে দেখে বলেন: 'বাঃ, এই তো হল আধুনিক কবির চেহারা– একদিকে সুধীন অন্যদিকে বিষ্ণু– এদেরেই বলে "নাগরিক!" বিষ্ণু বাবু তখন লিখেছেন অল্পই আর আমার মতো অধম তার অর্থভেদে প্রায় অক্ষম, কিন্তু ক্রমশ তাঁর কাব্যালোকে প্রবেশ না করতে পারলেও অস্পষ্ট অবলোকনের সৌভাগ্য কথঞ্চিৎ অর্জন করতে পেরেছি, অজস্র প্রসঙ্গ আলোচনার মধ্য দিয়ে তাঁর সর্বত্রচারী মানসিক গতিবিধির আস্বাদে বুঝেছি যে সম্ভবতঃ সমকালীন সকল

> সাহিত্য-স্রষ্টার মধ্যে সমাজবোধ ও শিল্পায়নের অদ্বৈত সার্থকতায় তিনি শ্রেষ্ঠ। এ ধারণা অকস্মাৎ আসেনি, এসেছে ধীরে, নানা বিতর্ক অতিক্রম করে।— সভা সমিতি ব্যাপারে অনীহাগ্রস্ত হলেও, 'প্রগতি' আন্দোলনকে মাঝে মাঝে বিদ্রূপ করলেও বিরূপতা দেখালেন না, বরঞ্চ নিজের ঈষৎ তির্যক ভঙ্গীতে সহায়তাই করলেন, 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে আমাদের প্রতিষ্ঠাকে সুগম করে দিলেন।[২]

সভা-সমিতির ব্যাপারে যে অনীহা, তা রাজনৈতিক সভা-সংগঠন বিষয়ক, কিন্তু সাহিত্যিক আড্ডার ব্যাপারে বিষ্ণু দে সব সময়েই ছিলেন স্পর্শকাতর, পরমোৎসাহী। 'কল্লোল সংঘ বা 'পরিচয়ের' আড্ডায় তাঁর যাতায়াত ছিল নিয়মিত ও সক্রিয়। তিরিশের দশক জুড়ে তিনি এসব সাহিত্যিক-মজলিশে যেমন অংশগ্রহণ করতেন, তেমনি কবিতা রচনায় ব্যক্তিগত ক্রিয়াশীলতার পাশাপাশি নানাবিধ গ্রন্থের সমালোচনাও লেখেন- বেশির ভাগ বিদেশী গ্রন্থের উপর। 'পূর্বলেখ' কাব্য রচনার (১৯৩৬-৪১) পূর্ব পর্যন্ত "বিষ্ণু দে নিঃসঙ্গ, কিন্তু সবার সঙ্গেই সম্পর্কিত।— প্রথম থেকেই কেন যেন মনে হয় 'পরিচয়'-এর বয়স্ক মণ্ডল থেকে একটু দূরে। কল্লোলের বোহেমিয়ান বন্ধুদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার জন্য ঈষৎ গঞ্জিত; কল্লোল-কালিকলম- প্রগতির হাওয়া থেকে একটু ভিন্ন এই জগতে যেন সামান্য আমন্ত্রিত- নিমন্ত্রিত ভাব।"[৩] আধুনিকত্ব এবং একই সঙ্গে স্বকীয়ত্ব অর্জনের প্রচেষ্টা এই নিঃসঙ্গতার মধ্য দিয়ে প্রস্তুতিকার্য সম্পন্ন করে চলছিল, যার শৈল্পিক অভিপ্রকাশ ঘটেছে 'পূর্বলেখ' কাব্যের শ্রেণী, ব্যক্তি ও বাস্তবসচেতন বিষয়লোক পরিগ্রহণে। ১৯৩৬ সালের দিক থেকে বিষ্ণু দের নিজস্ব কণ্ঠস্বর আবিষ্কারের পালা শুরু হয়েছিল, অর্থাৎ মার্কসীয় চেতনাকে কবিতাকর্মে অঙ্গীভূত করবার প্রয়াস ঐ সময় থেকেই আরম্ভ। এই কালে তাঁর আত্মিক জগতের সহযাত্রী ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিশেষত হীরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল দূরপ্রসারী ও কার্যকরী। তাঁর বন্ধুত্বের জোরেই বিষ্ণু দে তাঁর মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার সাংগঠনিক ক্ষেত্রটির সঙ্গে কিছুটা হলেও সক্রিয় থাকতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা পূরণচাঁদ যোশী[৪]; এই উভয় ব্যক্তিত্ব বিষ্ণু দের 'পিছিয়ে পড়াকে নিয়ন্ত্রণ' করতেন, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে কবির পরোক্ষ সংযোগকে রক্ষা করতে চলতেন। এখানে মার্কসীয় দর্শনে বিষ্ণু দের বিশ্বাস অর্জনের প্রেক্ষাপট ও কার্যকারণ-সূত্র ব্যাখ্যার আবশ্যকতা রাখে।

মার্কসীয় দর্শন ও কবির চেতনা

শিল্পী অথবা কবি যখন সাম্যবাদ সম্পর্কে অনুভাবিত হন, তখন তাঁর চেতনায় সমাজপ্রবাহের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বগুলির স্বরূপ ও গতি–প্রকৃতির নিহিত জটিলতা সম্পর্কে সচেতনতা জাগে অর্থাৎ তিনি বিদ্যমান অবস্থা (Condition) ও নিজ অবস্থান সম্পর্কে প্রথমেই প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকেন। যেহেতু সাম্যবাদ একটি বহুকালের প্রবহমান প্রত্যয় এবং কোন চূড়ান্ত বা অন্তিক আদর্শ নয়, তা হচ্ছে বর্তমানস্থিত সামাজিক কাঠামোর মধ্যকার পূর্ণবিকশিত এবং ক্রমাগতই অবক্ষয়িত গুণসমূহের ও দ্বান্দ্বিকতার অপরিহার্য গতিশীলতার ধরনকে বুঝে নেওয়ার প্রয়াস, সেহেতু প্রতিটি যুগেই আত্মসচেতন শিল্পী মাত্রেই সাম্যবাদের সংজ্ঞার্থে অনুবদ্ধ থাকেন। কেননা যন্ত্রণার প্রকাশ–যোগ্যতাই শিল্পের ধারাকে অবিচ্ছিন্ন রাখে এবং পরবর্তীকালের হাতে এর বহমান অস্তিত্বকে পৌঁছিয়ে দেয়। একমাত্র শিল্পের মধ্যেই যন্ত্রণার নিজস্ব স্বরটি তাৎক্ষণিক না থেকে বিশ্বজনীন হয়। আবার এই যন্ত্রণাবোধই শিল্পীর সৃষ্টিক্রিয়ার মৌলিক প্রণোদনা। কার্ল মার্কস প্রথমবারের মতো এই বিষয়টি তাঁর তত্ত্বের গর্ভে অনুস্যূত করে নিয়েছিলেন, যার প্রধান লক্ষ্যটা অবশ্য নির্ণেয় হয়েছিল শ্রেণী–সংঘাতের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল দ্বারা। সে–সূত্রে একজন সাম্যবাদী কর্মী বা রাজনীতিজ্ঞের ক্ষেত্রে যে অর্থে ও পরিমাপে সাম্যবাদ–প্রসঙ্গটি বিবেচ্য, কবির জন্য তা সে অর্থে নির্দিষ্টতা লাভ করে না, বরং অনির্ধারিত কৌণিক সম্পর্কের অপ্রত্যক্ষ প্ররোচনায় তার রূপ হয়ে ওঠে বিচিত্র, ছদ্মবেশী। সেখানে আরও নিহিত থাকে শিল্পগত পরিচর্যার ধরন, অবলম্বিত প্রকরণকলার নানামুখী অনুজ্ঞা–নিয়ন্ত্রণ–পরিশীলনের অন্তর্চাপ, সর্বোপরি বিরাজমান থাকে কবি ও বুদ্ধিজীবী হিসেবে দ্বৈত ভূমিকার সম্বন্ধ–পরম্পরাগত জটিলতা।

বিষ্ণু দের জন্ম ও বিকাশ ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় উদ্ভূত মধ্যশ্রেণীর প্রতিবেশে, যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটা অর্থনৈতিক শ্রেণীসত্তা রয়েছে, রয়েছে সমগ্র বস্তুগত পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রা প্রণালীর পার্থক্যের দ্বারা চিহ্নিত, শীলিত একটি রূপ ও বিশেষ মান। কিন্তু এ সত্ত্বেও মধ্যবিত্ত একটা শ্রেণী মাত্র, কোন সার্বিক সমাজ বা স্বয়ম্ভর শক্তি নয়। পুরো সমাজের সামগ্রিক মূর্ত, বাস্তব জীবনযাত্রার একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। ঐ সামগ্রিক জীবনের অপর বৃহদাংশটির অস্তিত্ব অন্যান্য শ্রেণীর জীবনযাত্রা ও চিত্তের আলো–আঁধারে বিরাজমান থাকে

এবং সেখান থেকে অস্তিত্বের সারাৎসার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মধ্যবিত্তের সজাগ চৈতন্যের আলোকে পরোক্ষতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কিভাবে এই রূপান্তর ঘটে, তা জানার অভিপ্রায়ই হল স্বশ্রেণীর মানসগত বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অন্য শ্রেণীর বাস্তবতার কাঠামোতে প্রবিষ্ট হওয়া এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে আর যুক্ত না থাকা। এই বিযুক্তি মানসিকভাবেও ঘটতে পারে। সে কারণেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে, যেমন দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা, বস্তু ও ভাবের বৈপরীত্য, অস্তিত্বের যন্ত্রণা, অহংবোধের অচরিতার্থতা (বিষ্ণু দের 'চোরাবালি' কাব্যে এই অসম্পূর্ণতা ও দ্বন্দ্বের বিক্ষেপজনিত প্রতিক্রিয়ার রূপটি প্রতিবিম্বিত) ইত্যাদি যতোই বৃদ্ধি পেতে থাকে, চিন্তা ও বাস্তবলোকের মধ্যে ব্যবধান ততোই প্রকট হতে থাকে। অসম্পূর্ণতার এই বোধ ও বস্তুগত দ্বন্দ্বের অন্তঃশীল বেদনা কবির নান্দনিক চৈতন্যকে তাঁর বিদ্যমান সামাজিক সীমাবদ্ধ কর্মজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে এবং শিল্পগত চৈতন্যের সবচেয়ে প্রাণিত অংশটি এক পর্যায়ে অন্তর্নিহিত আবেগ ও স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততার তাগিদে উক্ত বিচ্ছিন্নতার নিরসনে পূর্ণাঙ্গ জীবন নির্মাণের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। কিন্তু এই প্রক্রিয়ার মধ্যে চেতনার সমগ্র ক্ষেত্রটি আর পূর্বাপর বা অখন্ড থাকে না, ভেঙে কাঁচখন্ডের মতো তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে ওঠে। অখণ্ড মানস-প্রবাহটি কবি একেবারেই হারিয়ে ফেলেন। ঐ খণ্ড-বিখণ্ড ছিন্নাংশের বিন্যাসগত প্রতিবিম্বনে কবির শিল্পদৃষ্টি অসম্পূর্ণতা আর আত্মখণ্ডায়ন থেকে এক পূর্ণায়ত অনুভূতির মিথে (Myth) উপনীত হতে চায়। কারও ক্ষেত্রে ঐ অসম্পূর্ণতার বেদনা ও দ্বন্দ্বের আর্তস্বরই ঐকান্তিকতা পায়, কারও ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ জীবন-প্রত্যাশী মিথ-প্রকল্পটি শিল্পের যথাবিহিত ফর্মে রূপান্বিত হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আবেগ এবং অভিজ্ঞতার দ্বারা বিপরীত মেরুর দিকে তাঁর চেতনার আকর্ষণকে প্রবলতর করে এবং স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে সংগঠনী শক্তির মধ্য দিয়ে বাস্তবতা, স্পষ্টতা দিতে উৎসুক হয়। ফলে স্বীয় শ্রেণীচেতনার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে বিপ্লবী সত্তার সঙ্গে লগ্ন হতে থাকে এবং সেটা ঐ বিচ্ছিন্ন-হওয়াকালীন যে-চৈতন্যের অংশ, তার সঙ্গে অভিযোজিত হয়। তখন এটা হয়ে ওঠে সন্ধি-চৈতন্য; বিপ্লবী চেতনায় পুরোপুরিভাবে উপনীত হওয়ার আগেই ঐ বিশ্লিষ্ট চৈতন্যটি একটি দোলাচল, দ্বৈতত্ব, কখনও বা দ্বৈধতায় রক্তাক্ত হতে থাকে; বিক্ষুব্ধ হতে থাকে। আলোড়ন-বিলোড়নের ঐ সন্ধি-সময়কালে শিল্পমানসটি তখন শিল্পধর্মী হওয়ার চেয়ে বরং হয়ে ওঠে

বিজ্ঞানশুদ্ধ, আবেগাত্মক হওয়ার চেয়ে পর্যবসিত হয় বুদ্ধিবাদের তীক্ষ্ণতায় উচ্চকিত।[৫] বিষ্ণু দের কবিমানসে মার্কসীয় দর্শনের অনুক্রমণ এবং কবিতায় পরিগ্রহণের প্রশ্নে উপরিউক্ত আংশিক বিপ্লবী-মানস, স্বপ্ন-সম্ভাবনার উজ্জীবনী শক্তিকে আমৃত্যু চৈতন্যে লালন এবং বুদ্ধিবাদের প্রবলতা—এসব সূত্রই কমবেশী দৃষ্টিগোচর হয়।

পূর্ববর্তীকালের মানবতাবাদ বা সাম্যবাদের যে ধরন ও ধারণা, তার সঙ্গে মৌলিক পার্থক্য সূচিত করেই মার্কসবাদ নতুন প্রকল্প বিধৃত করেছে। যার মূলীভূত রূপটি হচ্ছে এই যে, মার্কসীয় চেতনা আর্থসামাজিক কাঠামোর মৌল দ্বন্দ্ব হতে উৎসারিত না হয়ে যদি হয় চেতনার আরোপিত ঔচিত্যবোধ ও সামাজিক মঙ্গল কামনার আদর্শবাদী দৃষ্টিভঙ্গি হতে, তবে সে ক্ষেত্রে যুক্তিবাদ ও পাণ্ডিত্যের অংশই বাহ্যত প্রাধান্য বিস্তার করতে পারে। বিষ্ণু দের কবিমানসের বিশ্লেষণে পাণ্ডিত্য-বিষয়ক নিন্দাবাদ একটি প্রচলিত প্রশ্ন। কিন্তু এজরা পাউন্ড-তুল্য পাণ্ডিত্যধর্মী শিল্পপ্রকরণ তৈরি করলেও (যা বিশেষভাবে রয়েছে 'চোরাবালি' পর্বে—১৯২৬-৩৬) মার্কসীয় চেতনায় স্থিতিলাভের পরবর্তীকালীন বিষ্ণু দের যে পাণ্ডিত্য, তার পৃথকত্ব ভিন্ন-তাৎপর্যেই বিশ্লেষণ করতে হয়।

বিষ্ণু দে মার্কসবাদে স্থিত হয়েছেন তাঁর স্বশ্রেণী-সংলগ্ন চৈতন্যের সংকট-সমাধানের নিরসনে যতটুকু, তারও কম কোন পার্টি বা সাংগঠনিক আদর্শের প্রভাবে। স্বীয় চেতনায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অবক্ষয় ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবির আত্ম-প্রকাশের নান্দনিকবোধ বিচ্ছিন্নতার সংকটে আক্রান্ত হয়েছিল। এই বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কবি-সত্তার, শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর, কবিতায় অবলম্বিত বিষয়ের সঙ্গে আঙ্গিকের, কাব্যের সঙ্গে পাঠকের— এ জাতীয় নানা কৌণিক দ্বন্দ্বই সেখানে বিরাজিত ছিল; ছিল স্বাধীন, পূর্ণ-ব্যক্তিত্বের স্ফূর্তির সঙ্গে ঔপনিবেশিক পরাধীনতার অভিশাপ, শিক্ষার সঙ্গে জ্ঞানের বিরোধ, বিকারের সঙ্গে বুদ্ধির-আবেগের তরলতার সঙ্গে মননশীলতার অসামঞ্জস্য। বিচ্ছিন্নতার নিরাকরণে তাঁর প্রথম আশ্রয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের পঠন-পাঠন। এ ক্ষেত্রে যেমন তিনি নির্বিচারভাবে সব ধরনের গ্রন্থই পাঠ করতেন, তেমনি প্রভাবিত হয়েছেন মার্কস-পূর্ব জ্ঞানবিজ্ঞান- ঐতিহ্য- শিল্প-সাহিত্যের আলোকে। পার্টি পলিটিক্সে সংঘ শক্তির সমবায়ে সমাজ-পরিবর্তনের সক্রিয় মার্কসপন্থার

সঙ্গে নিজেকে না জড়িয়ে তিনি প্রসঙ্গটিকে শিল্পের ও জ্ঞানের সঙ্গে সমীকরণ করে নিলেন। কারণ এর মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল 'সেই প্রাক্-প্রবুদ্ধি' বা দীর্ঘ দৃষ্টিকে অর্জন করা, যার সঙ্গে একীভূত হয়ে আছে একটা বিশেষ অভীষ্ট, একটি জীবনার্থসূচক অনুজ্ঞা। "মার্কস ও এঙ্গেলস আমাদের পক্ষে সম্ভব করেন এই প্রাক্-বুদ্ধির অন্বেষা এবং তার চর্চা এবং তা নান্দনিক ক্রিয়াকর্মের ক্ষেত্রেও"[৬]। স্বয়ং কবির অনুসন্ধিৎসা ও একই সঙ্গে বেদনাবোধ এই প্রাক-প্রজ্ঞা সম্পর্কে ছিল সদাজাগ্রত। কেননা, তাঁরই মতানুযায়ী উক্ত প্রাক-প্রজ্ঞা হচ্ছে শুধুমাত্র সদা-প্রস্তুত থাকার একটা সক্রিয় অবস্থা— 'প্রস্তুতিই সর্বসার'- এই অর্থে এবং তা সম্পূর্ণতই আত্মসচেতন কবি-পুরুষের নান্দনিক প্রজ্ঞা। বর্তমান ও অতীতকে চলমান গতিশীলতায় সুস্পষ্ট করে দেখা অর্থাৎ প্রক্রিয়াটির মূল, স্থায়ী দিকগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করাই হচ্ছে ঐ 'প্রাক-প্রবুদ্ধির' সূত্র। আধুনিক বিশ্বের ভগ্ন, জটপাকানো, নিঃসঙ্গ অস্তিত্বের যে-বোধ নিয়ে কবির আত্মসচেতনতা, তার জন্যও মস্ত সহায় হলেন মার্কস। মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক ন্যায় আর মানবিকতা ও মানুষের সক্রিয় সৃজনক্রিয়াকে স্বীকৃতির যে সূত্র রয়েছে[৭], রয়েছে আত্মবোধসম্পন্ন মানুষের যে- কথা, সবই কবির প্রাক্-প্রজ্ঞার সন্ধানে একটা পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। বিষ্ণু দের কাব্য-সাধনার মৌলিক প্রেরণা এখানেই- এই মানবিক দর্শনের প্রত্যয়ে, আত্মবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশে। কারণ তিনি গ্রাহ্য করে নিয়েছিলেন বাস্তবের অবস্থান ও রূপকে এবং নিজেও গ্রহণ করেছেন সেই বাস্তবের দ্বান্দ্বিকতায় যুদ্ধরত এক কবিসত্তা হিসেবে- যার প্রকৃষ্ট বিশ্লেষণ রয়েছে থিওডোর এডরনোর *Commitment* শীর্ষক আলোচনায়, যেখানে তিনি বলেছেন[৮] যে, বাস্তবকে দেখবার স্বাধীনতা ও শুদ্ধতা শিল্পী মনেরই দায়বদ্ধতা, যা না থাকলে সব অধিকারই ভ্রষ্ট হয়। মানুষের জীবনে যখন বাস্তবতার দ্বৈত অবস্থান সহাবস্থানের মধ্যে শান্তিতে পূর্ণ থাকে, তখনও শিল্পী তার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন না, বরং তিনি এর ভেতরের এক অভ্যন্তর-লড়াইকে উন্মোচন করে আনেন। এই লড়াই তার মানসজীবনের সম্ভাবনাকে টিকিয়ে রাখে। পৃথিবীর একটা বসবাসযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য শিল্পরূপ গড়বার আকাঙ্ক্ষায় যেহেতু তাঁকে অসম্পূর্ণ, অপূর্ণাঙ্গ বাস্তবের সঙ্গেই উৎকট সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হয়, সেহেতু কবিসত্তার পক্ষেই সম্ভব এন্টিথিসিসের প্রচণ্ডতায় অবিরাম লিপ্ত হয়ে থাকা। বিষ্ণু দে শিল্পকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন সেই লক্ষ্যে; যার উপযোগিতায় বিশ্বকে

দেখার ও উপলব্ধি করার, এক অর্থে আয়ত্তাধীন করবার একটা বিশেষ উপায় যথাযোগ্যতা পেতে পারে। এটা তাঁর ক্রমবর্ধিষ্ণু আত্মসচেতনতাকেও এলিয়টীয় আত্মসচেতনতার সীমাবদ্ধতা থেকে একটি প্রেক্ষণ–বিন্দুতে সংহতিদানের ব্যাপারে ভূমিকা পালন করছিল। মার্কসবাদ এই কবির ক্ষেত্রে আরও গভীরত্ব পায়, যখন তিনি সেই সমস্যার মুখোমুখি দণ্ডায়মান হন, যে সমস্যা ছিল রবীন্দ্র–পরবর্তী কবিতায় প্রতিষ্ঠানবিহীন নিঃসঙ্গ ব্যক্তিসত্তাকে এবং সেই সত্তার অভিব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী বিকাশকে নিরালম্ব শূন্যতার গ্রাস থেকে রক্ষার প্রকল্প তৈরি করা।

এইসব অন্তর্গূঢ় কার্যকারণ ছাড়া পরিবেশগত আবহ কিভাবে বিষ্ণু দের চেতনায় মার্কসবাদের অঙ্গীকার নিষ্পন্ন করেছিল, তা আলোচনার দাবী রাখে। এবং আরও বিবেচ্য, চৈতন্যের প্রাথমিক পর্যায়ে বিষ্ণু দের রয়েছে যে উদারনৈতিক ভাববাদী চিন্তার প্রতিপালন, তার সঙ্গে মার্কসীয় আদর্শের সংঘাতটা কি ধরনের ও সামঞ্জস্যই বা কতোখানি ঘটেছে।

রবীন্দ্র–বিপরীত বর্ণমালা আবিষ্কারের অভিযান বা কল্লোলীয় রোমান্টিক আবহের প্রতিবাদ করলেও বিষ্ণু দের মূল সমস্যা ছিল আত্মসত্তা সংকটের দর্শনকে শিল্পকলার শুদ্ধতায় সার্বভৌমত্ব দেওয়া এবং এই প্রয়াসে দেশকাল প্রেক্ষাপটের বিরোধমূলক শর্তাবলীকে যুক্তির গ্রন্থিতে বিদ্ধ করা। অর্থাৎ চিন্তা চেতনার একটি সংহত বিশ্ব তিনি তাঁর বহুধাদীর্ণ কবি–মানসকে উপহার দিতে চাইছিলেন। স্বয়ং কবির ভাষ্য, "— বোলশেভিক বিপ্লবের বার্তা আমরা পাই খবরের কাগজের কোণে সংক্ষিপ্ত সংবাদের মাধ্যমে আর মাঝে মাঝে হয়তো রাসেল বা ল্যাস্কির মতো কুণ্ঠিত দার্শনিক বা পণ্ডিত ব্যক্তিদের শরণ নিতে হত জ্ঞানের খোঁজে। বস্তুত বিশ্বকম্প সেই দশ দিন তখনও আমাদের কাছে বহু দূরের ব্যাপার ছিল। তাই কার্ল মার্কসের বিশ্ব–দর্শনের তত্ত্ব ও কর্মযোগও আমাদের চৈতন্যে অঙ্গীভূত হতে লাগল ধীরে ধীরে এবং স্তরে স্তরে, পর্বে পর্বে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন কাজের কাঠামোর ঘরানার মধ্য দিয়ে।"[৯]

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, স্বীয় সত্তায় সংহতি আবিষ্কারেই বিষ্ণু দে মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী হলেন, "স্পষ্টত সক্রিয় দ্বন্দ্বময়তায় সামাজিক ও মানবিক দৃশ্যের সংলগ্নতায় বাস্তবের যন্ত্রণাবোধ থেকে সত্তা আবিষ্কারে বিষ্ণু দে গঠন করেন তাঁর তত্ত্বজগৎ, যেখান থেকে তাঁর কবিতাই পায় জল

হাওয়া।"[১০] কেননা তত্ত্বজগৎ তখন একটা বিষয়-সত্তায় পর্যবসিত হয়। যে কোন ব্যক্তিমানসেই যখন কোন ভাব বা চিন্তার অঙ্কুরোদগম ঘটে এবং যখন ঐ ভাব কোন মাধ্যমকে অবলম্বন করে শিল্পকর্মরূপে পুষ্পিত হতে চায় বা দার্শনিক তত্ত্ব হিসেবে বলয়িত হয়, তখন তা একটি স্বতন্ত্র সত্তা অর্জন করে। যা ছিল শিল্পী বা দার্শনিক মনের একান্ত প্রাতিস্বিক বিষয়, তা সর্বজনীন বিষয় হয়ে ওঠে, আর বিষয়ী হিসেবে সীমায়িত থাকে না। মননজাত এই ভাব এভাবে বিষয়গত সত্তা অর্জনের মধ্য দিয়ে কোন-না-কোন ভাবে সমাজ-বিন্যাসকে, মনোজগৎকে প্রভাবান্বিত ও নিরূপিত করে থাকে। বিশ্ব দর্শনের অভিব্যক্তিই মহৎ সাহিত্যের অন্তিক অঙ্গীকার ও চিরায়ত বাসনাও বটে। এই বিশ্ব দর্শন থেকেই আসে বাস্তবের সুসঙ্গত ঐক্যবদ্ধ রূপের জিজ্ঞাসা ও ধারণা। নিছক ব্যক্তি-বিশেষের ধারণা বা চিন্তা কদাচিৎ সঙ্গত ও সুসমঞ্জস হয়ে উঠতে পারে। বাস্তবতার দ্বৈত চাপে, ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের প্রভাববশতই শুধু নয়, ব্যাপক অর্থে এমনকি শারীরিক গঠনের জটিল প্রভাবেও, কোন ব্যক্তি-বিশেষের অনুভূতি ও ভাবনা কোন-এক-রকমের সঙ্গতিলাভের কাছাকাছি যেতে পারে মাত্র। তবে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ দুর্লভ। অতএব বিশ্বদর্শন, যাকে মার্কস অভিহিত করেছেন weltanschanung, তা ব্যক্তির সুসঙ্গতি ও ঐক্য নীতির জন্য অপরিহার্য একটি প্রেক্ষিত। মার্কসীয় দর্শন ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রে এই প্রেক্ষিত এনে দেয়, যেখানে নিঃসঙ্গ ব্যক্তি-মানুষ প্রকৃতি-পরিবেশ ও সমাজ-পরিবেশের আশ্রয়-আশ্রয়ীভাবের অন্বয়ে ইতিহাসের গতিময়তায় সদর্থক হয়ে ওঠে। প্রথম কাব্য 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'ই বিষ্ণু দে উক্ত নিঃসঙ্গ সত্তার প্রকৃতি-প্রতিবেশের মধ্যে আশ্রয়ী-ভাবটিকে ধারণ করতে চেয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য, 'সোহবিভেত্তস্মাদেকাকী বিভেতি' কবিতা, 'উর্বশী ও আর্টেমিস)'।

বিষ্ণু দে তাঁর চৈতন্যের গভীরে আরও অনুভব করেছেন, যে কোন বিবর্তনের নিয়মেই মনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে শিল্পের শরীরে- সবচেয়ে বেশি মাত্রায়। ইতিহাস ও মানবমন যে দ্বান্দ্বিক ঐক্যে অন্যোন্য এবং শিল্পের দেহে উৎকীর্ণ, তা উপলব্ধির অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছেন মার্কসীয় দর্শন দিয়েই। এ অর্থে তাঁর সাহিত্য-রুচির পরিপ্রেক্ষিতও উক্ত দর্শন দ্বারাই বিশেষিকৃত। তদুপরি বিশৃংখল ব্যক্তি-সবর্স্ব অবস্থা থেকে শিল্পের কাঠামোগত বিন্যাসে শিল্পীসত্তাকে নিয়ে যেতে পারে যে যাথার্থ্যের চাপ- যেখানে মানবিক লুপ্ত-সম্বন্ধের পুনরুদ্ধার ঘটে ভাষার নিরূপিত বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করে বিষয় ও ছন্দের অদ্বৈত সক্রিয়তার সহযোগে, তারও ইঙ্গিত মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বে

অন্তর্নিহিত। বিষ্ণু দের সমাজসত্তা অনুভব করেছিল এই তথ্য যে, মার্কসবাদ যুক্তিবুদ্ধি ও বিজ্ঞানের পরিণতিতে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, বিশেষত শ্রমবিভাজনের শৃংখলের, অনন্বয়ের মধ্য থেকে উদ্ধার করে আনতে চেয়েছে মানবিক সম্পর্কের সমগ্রতা ও বৈভব। মানবিক–অন্বয়ের এই কার্যকারণেই তাঁর কবিসত্তা মার্কসীয় দর্শন দ্বারা সেখানেই প্রভাবিত, যেখানে তা মানুষের সম্বন্ধ–সমূহ অনুধাবনে সহায়তা করে, মানুষের শক্তির দিক সম্পর্কে অবহিত করে, আর অমেয় সম্ভাবনার দিকে ধাবিত করে। মার্কস সম্পর্কে বিষ্ণু দের স্বীকৃতির মূলে এই বক্তব্যের সমর্থন পরিলক্ষিত হয় যখন তিনি বলেন, "মার্কসের বিশ্বকৌষিক মনের বিরাট কর্তৃত্বের জুড়ি বোধ হয় পৃথিবীতে আর হয়নি। মুষ্টিমেয় বিশ্বমানবদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ মননশীল এবং সবচেয়ে নৈর্ব্যক্তিকভাবে মানবিক, অধিকন্তু তাঁর ছিল স্বীয় চিন্তার প্রক্রিয়ারই প্রবল যন্ত্র যার আলোক রশ্মিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল দূরের অস্পষ্ট অনেক কিছু—। সবচেয়ে বড় কথা যে তাঁর চিন্তা ও ক্রিয়াকর্মের কল্যাণে পরবর্তী আমরা সবাই পেয়েছি সর্বমানবের ইতিহাস বিষয়ে কাজ করবার বৈজ্ঞানিক রীতিটি আর পুরোধা তথ্য ও তত্ত্ব–সন্ধানের উত্তরাধিকার।"[১১]

প্রসঙ্গত ব্যক্ত করেন সমকালীন বাস্তব– প্রতিবেশের শর্তাদিও, "গান্ধিজীর আন্দোলনগুলো দেশকে দোলা দিচ্ছে আর থেকে থেকে প্রত্যাহার, প্রায়শ্চিত্ত চলছে। চোখের সামনে শ্বেত রাজকীয় লোভের মরিয়া প্রতাপের মধ্যে। তারপরে তো এসে পড়ল চীন–জাপানের লড়াই, স্পেনে এল সভ্যতার বীরত্ব ও প্রতিক্রিয়ার জোটের কাছে শেষ পর্যন্ত লজ্জাকর হার ; এল মুসোলিনী হিটলারের ফ্যাসিজম, পৃথিবী হয়ে উঠতে লাগল অসমতার মধ্যে মনে মনে একটি দুনিয়া।"[১২] তিরিশের দশকে বাংলাদেশের সমাজগঠনটি ক্রমশই মার্কসবাদী চিন্তার দিকে ঝুঁকছিল, বিশেষ করে তৎকালীন শিল্পী–সাহিত্যিক গোষ্ঠীর কাছে বিষয়টা ছিল সমাজগঠন প্রক্রিয়ারই অনিবার্যতা। কেননা, তিরিশের দশক থেকেই বাঙালী ভদ্রলোকের সংস্কৃতি ও সামাজিক দৃষ্টিকোণে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। উদারনৈতিক মধ্যবিত্তের যুক্তিবাদী অংশের মধ্যে ভাঙন লক্ষণীয় হয়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে শ্রমজীবীর নিজস্ব কোন মতবাদের শূন্যতা বিরাজ করতে থাকে। এ অবস্থায় তিরিশের সাহিত্যিক গোষ্ঠী ছিল একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াগ্রস্ত ও প্রগতিকামী। একই সঙ্গে তারা আত্মসচেতন অথচ নৈর্ব্যক্তিক। সমাজ–অস্তিত্বের যে ফর্ম, সেদিক থেকে

তাদের জীবিকার যে শহুরে পেশাগত উৎসটি ছিল, তার ধরনই ছিল বাকী সমাজ থেকে দূরত্বে-অবস্থান। কল্লোলীয় রোমান্টিকতার আবরণে আচ্ছাদিত তথাকথিত বাস্তববোধের চর্চায় উক্ত দূরত্ব দূরীভূত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না, বরং সংকট আরও গভীরতর হয়। আরও অপরিহার্য হয়ে ওঠে বুদ্ধিবাদী বিতর্কের মধ্য দিয়ে সমকালীন পৃথিবীর দার্শনিক-সমাজতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের আয়তনে নিজেকে দাঁড় করানো—প্রবর্ধমান শ্রমজীবীর সঙ্গে দ্বান্দ্বিকতায় সাযুজ্য সন্ধানের সূত্রে এবং উন্মূল বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব ও আত্মসচেতনতার ঐতিহাসিক পটভূমি লাভের বাসনায়।[১৩] একেই বিষ্ণু দে বলেছেন, 'মনে মনে একটি দুনিয়া' অসমতার মধ্যেও। এদের ধর্তব্য বিষয় ছিল ঐতিহ্য ও গ্রামজীবনের ফেলে-আসা সম্পর্কের পুনরুদ্ধার নিয়ে চিন্তাভাবনা করা—চিত্রে, কবিতায়, গল্পে-উপন্যাসে। বিষ্ণু দেও ঐতিহ্যিক ভাবনার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যায় মধ্যশ্রেণীর আত্মপীড়ন প্রবল হচ্ছিল, তার নিরাকরণে মার্কসীয় ঐতিহ্যবাদকে আশ্রয় করলেন এবং এলিয়টের ঐতিহ্যভাবনার বিরোধী হলেন। এলিয়টের নৈর্ব্যক্তিকতার গভীরতায় ঐতিহ্যের যে-ধারণা, বিষ্ণু দে তাকে মনে করেন শিল্পীর ভাবদুর্গমাত্র; কবিতার উপজীব্য জোগালেও এলিয়টীয় ঐতিহ্যবোধ মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। এই পর্যায়ে বিষ্ণু দে সচেতনভাবেই চিহ্নিত করেন এলিয়টের রাজনীতি চিন্তার কারুণ্য, বিজ্ঞানে অবিশ্বাস আর খণ্ডিত মানবচৈতন্যকে।[১৪] উক্ত এলিয়টীয় ঐতিহ্যের স্বরূপটি হচ্ছে "...the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its present, the histrical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones, but with a feeling that the whole of the liberation of Europe from Homer and within in the whole of the literature of his own country has a simultaneous existence and composes a simulteneous order ..... This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer tradition."[১৫] অর্থাৎ লেখকের ইতিহাসভিত্তিক ধারণা থাকা আবশ্যক। যে ধারণা তাকে শুধু নিজের প্রজন্ম সম্পর্কে নয়, বরং তাকে অনুধাবনে সহায়তা করবে যে, প্রাচীন থেকে প্রবহমান সামগ্রিক সাহিত্যের জগৎ এবং একই

সঙ্গে নিজের দেশেরও সামগ্রিক সাহিত্য একই সঙ্গে বিরাজ করছে ও একটি নিয়মবদ্ধতায় সংবদ্ধ হচ্ছে। বিষ্ণু দে এই ধারণাকে মার্কসীয় দর্শনালোকে ভিন্ন সক্রিয়তায় বিশ্লেষণ করেন। কারণ বর্তমান থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অতীতের যেমন কোন অর্থ থাকে না, তেমনি বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্ত অতীত সম্পর্কে তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি বহন করে চলে। তদুপরি বিচ্ছিন্নভাবে কোন কবি বা শিল্পীর কোন তাৎপর্য নেই, বৈপরীত্য বা তুলনামূলক ব্যাপারটা অনুধাবনের জন্য তাকে মৃতদের মধ্যে অর্থাৎ ঐতিহ্যের মধ্যে স্থাপন করতে হবে এবং পুরো বিষয়টাকে ধারণ করতে হবে একটা ব্যাপক বিস্তৃতিরই অংশ হিসেবে। অন্যথায় তার অংশভাক্ অবাঞ্ছনীয়। আমাদের নিজের বাস্তবজীবন যে–ভাবে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে, আমরা সেভাবেই অতীতের বিবেচনা করে থাকি। আমাদের জীবন শুধু ঐতিহ্যের উপর দণ্ডায়মান নয়, তা দাঁড়িয়ে আছে জটিল জীবন–সংগ্রামের বাস্তবতারও উপর। প্রতিটি যুগেই নতুন সৃষ্টির মধ্যকার পরিবর্তনের পশ্চাতে এই সংগ্রাম সক্রিয় থাকে। এই পরিবর্তনশীল বর্তমানকে দেখাই বাঞ্ছনীয়। বিষ্ণু দে এ–রকম একটি পরিবর্তনশীল, দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের আলোকে নিজের চৈতন্যে এলিয়ট–পথ পরিহার করে সমাজ–সংস্কৃতির আওতায় নিজ–ব্যক্তিত্বকে সমাসীন করতে চাইলেন।

তবে যেহেতু তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল বুর্জোয়া মতাদর্শের বিপ্রতীপ অবস্থানে দাঁড়িয়ে, সে কারণে তিনি লোকসংস্কৃতির সুস্থতা ও বলিষ্ঠতা যেমন সন্ধান করেন, তেমনি মধ্যশ্রেণীর সংস্কৃতির মধ্যেও বৈপরীত্যময় আঁতাত গড়ে তুলতে উৎসুক হন।[১৬] যে ঔৎসুক্যের পেছনে রয়েছে শ্রমজীবীর সঙ্গে কবিসত্তার বুদ্ধিবাদী সম্পর্কের টানাপোড়েন। ফলে তিনি তিরিশের অন্য কবি–সাহিত্যিকদের মতোই একদিকে এ্যাকাডেমিকভাবে বিচ্ছিন্নতাকামী থাকতে আকাঙ্ক্ষী, আবার একই সঙ্গে মতাদর্শগত সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র সন্ধানে তৎপর। বিচ্ছিন্নতার দরুণ ভাববাদের প্ররোচনা জাগলেও ঐ সহযোগিতার সূত্রেই লোকসমাজ ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে একটি যোগসূত্র ব্যাখ্যায় অক্লান্ত হয়ে ওঠেন। অথচ পাশাপাশি আবার শিল্প–সাহিত্যের মৌল স্বাধীনতার সংরক্ষণে, শিল্পী–সত্তার ব্যক্তিকতার শুদ্ধতায় থাকেন নির্বিকল্প। ফলে অনিবার্যতই তাঁর অবস্থান দাঁড়ায় সুধীন্দ্রনাথ–বুদ্ধদেব বসুর বিপরীতে। শেষোক্ত কবিদ্বয়ের মতোই বিষ্ণু দেও ইন্দ্রিয়মুখী ও অভিজ্ঞতাশ্রয়ী। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসু–উভয়ের মধ্যে ভাববাদের সূত্রে একটি মিলনবিন্দু রয়েছে, যেখানে তাঁরা উভয়ে ব্যঙ্গ করছেন মার্কসবাদকে, যে বিন্দুটি হল

ঔপনিবেশিক ধনতন্ত্রের উদারনৈতিক মানবতাবাদী মূল্যবোধের সঙ্গে ধনতন্ত্রের পরিবর্ধনশীল ফর্মের সে-সংঘাত— সেই প্রশ্নে সুধীন্দ্রনাথ আভিজাত্যের অবক্ষয়ে ট্র্যাজিক, আবার ভবিষ্যতেও গভীর ভাবে অবিশ্বস্ত। বুদ্ধদের বসু ইন্দ্রিয়বাদ থেকে ঐতিহ্যের যে আয়োজনে প্রত্যাবর্তন করেন, তাও এক ধরনের ভাবদুর্গই মাত্র। অথচ শিল্পীর স্বাধিকার রক্ষায় তাঁর সংগ্রাম বহুমাত্রিক, অনলস।

একই প্রসঙ্গে অর্থাৎ ঐ স্বাধিকারের প্রশ্নে, উদার মানবতাবাদের সঙ্গে সংঘাতের জিজ্ঞাসায় বিষ্ণু দের সম্পূরণ ঘটে মার্কসীয় ইতিহাসবোধে ও শিল্পীসত্তার ব্যক্তিক বিকাশে। 'ব্যক্তিত্বের নব নব বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা' ও শিল্পীর স্বাধীনতার শর্ত তাই তাঁর অনিবার্য একটি আরাধ্যবিষয়, যা তিনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেন। আবার এ-সূত্রেই বিষ্ণু দে সমকালীন বঙ্গদেশীয় সংস্করণ হিসেবে যে মার্কসবাদ ছিল সর্বাধিক প্রচলিত, তা থেকেও স্বতন্ত্র হয়ে যান। তৎকালীন সহযাত্রীদের অনেকের মার্কসবাদকেই তাঁর মনে হয়েছে 'বুদ্ধিজৈবিক অসংলগ্নতা'। তিনি ঝোঁক দিয়েছেন ব্যক্তিক অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে স্বকালের বিশ্বপটে স্থাপনের নান্দনিক প্রয়াসের উপর এবং এটাই মার্কসবাদী কবি হিসেবে তাঁর ব্রত। যদিও সেই ব্রত পালনে মূর্ত জীবন-যাপনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা শিল্পের পরিকেন্দ্রে ধারণ করতে চেয়েছেন বোধ ও বুদ্ধির সমগ্রতা দিয়ে, যে বোধ বুদ্ধি আবার একটি সামগ্রিক দৃষ্টি-বৈভবের শৃঙ্খলান্যায় থেকে উদ্ভূত। এই বোধবুদ্ধির ভিতেই বিষ্ণু দের কবিতার ছন্দস্পন্দন, ইমেজের অন্তর্বয়ন ও শব্দসজ্জার বিন্যাসটি দাঁড়িয়ে আছে।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব : কতিপয় প্রবক্তা ও ব্যক্তিত্ব এবং বিষ্ণু দে

মার্কসীয় চিন্তাদর্শের বিশ্লেষণ নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে বহুমুখী রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এখনও এর ভাবনার গতি অস্থিতিশীল। আমরা প্রাসঙ্গিক আলোচনায় বিষ্ণু দের চেতনায় যে-সব মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ববিদের প্রভাব রয়েছে এবং মানসিক সাযুজ্য পরিলক্ষিত হয়, সে-সব ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করবো।

প্রথমবারের মতো সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে গেওর্গ লুকাচের (১৮৮৫-১৯৭১) মার্কসীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ একটি সুসংবদ্ধরূপ ধারণ করেছে।

হাঙ্গেরীতে জন্মগ্রহণকারী এই মার্কসবাদী কর্মী ও লেখকের চিন্তাদর্শের সঙ্গে বিষ্ণু দের মনোগত সামঞ্জস্য চিহ্নিত করা সম্ভব। লুকাচ শিল্প–সাহিত্য চর্চার মধ্য দিয়ে জীবন সাধনার ব্যঞ্জনা অনুভব করতেন; এমনকি বিজ্ঞান–দর্শনের চেয়েও শিল্পই ছিল তাঁর কাছে ঐকান্তিক; তাঁর কাছে এ সত্য ধরা পড়েছে যে, কালের মূল সত্যের সঙ্গে একমাত্র কবিরই সংযোগ সবচেয়ে অন্তর্নিহিত। বিশ্বরচনা ও তার প্রকাশের পক্ষে যোগ্য ফর্মটি শিল্পীরাই আবিষ্কার করেছেন, এমন কি তাঁর ধারণায় শিল্প এমন প্রামাণিকও (authentic) হতে পারে, যেখানে তা বিশ্বের রহস্যময়, প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিরই প্রকাশহেতু চিরন্তন মূল্যবোধের ধারক হয়ে ওঠে ও মহত্ত্বে বিভূষিত হয়। এর তাৎপর্য কি? কবিতায় বিধৃত প্রতিটি বস্তুই একক, অতুলনীয় ও সম্পূর্ণ এবং তা নিছক সমস্যাপুঞ্জের সমাবেশ নয়, তা বহন করে এক আন্তরগত সম্পর্কের ধারণা ও মূল্যবোধ এবং বাস্তব ও নির্দিষ্ট সত্তা—অবশ্য এ বাস্তবতা ও সত্তা শিল্পবিশ্বের নিজস্ব একটি বিষয়। শিল্পীর অন্তর্লোক এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে ঘটনাসমূহের নির্যাস জন্ম দেয় এক সম্ভাবনাময়, উৎপদ্যমান নকশার; ঐ নকশায় স্টুটতর হতে থাকে ভবিষ্যৎ–কথনের সূত্রমাল্য। কবিদের আয়ত্তে বিশ্বজনীনতা থাকে বলেই এমনটি ঘটে, আর এটা সম্ভব হয় শিল্পকর্ম যেহেতু তার নিজের বিশ্বে শিল্পীর মানসিকতা রূপান্তরের তাৎপর্য বহন করে—কবির মানসিকতা শিল্প রচনার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত ও অন্যস্বরূপে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

লুকাচের অভিমত, নান্দনিক চৈতন্য বিরাজ করে ব্যক্তিসত্তা ও সর্বজনীন সত্তার মধ্যকার যোগসূত্র হিসেবে এবং সাহিত্য–কর্মের কাজ শিল্পীর নিজেরই অভ্যন্তরে ও নিজের জন্যই অপরিহার্য, তাই মহৎশিল্প মাত্রেই ব্যক্তিগত। সবরকম বিচ্ছিন্নতা বাদ দিয়ে মানুষের অন্তর্জীবন এবং তার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ও অনিবার্য সংঘাতকে সামাজিক–ঐতিহাসিক সেতুবন্ধে সাংগঠনিকভাবে যুক্ত করে বিচার করতে হবে, যাতে তা মনস্তত্ত্ববাদীর তথাকথিত শরীরনির্ভর প্রকৃতিবাদের মতো বিমূর্ত না হয়ে পড়ে, আবার নিছক যান্ত্রিক প্রকৃতিবাদও না হয়।[১৭]

বিষ্ণু দেও পূর্ণ মানবীয় ব্যক্তিত্বের জীবন্ত রূপদানের ক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী বা তথাকথিত বিশুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টিবাদী নন। কারণ তাঁর কবিতায় তিনি একান্তই ব্যক্তিক মানুষকে আঁকেন না আবার যথাযথ রূপেও নয়। তিনি সর্বত্রই এক

প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রসৃজনে উদ্যোগী, যা কোন কোন ক্ষেত্রে পুরোন, প্রচল প্রতিমানকে পর্যন্ত ভেঙে বেরিয়ে আসে নতুন অর্থে-রূপে, নতুন ধীশক্তিতে। বিষ্ণু দের কবিমানসে সকল প্রতিমাই এই তাৎপর্যে বিধৃত। লুকাচের মতোই তিনিও বাস্তব ও প্রত্যক্ষ প্রপঞ্চপুঞ্জ ও অন্তঃশীলা বিমূর্ত নিয়মাবলীকে পরস্পর সাপেক্ষতায় নিজ কবিমানসে ধারণ করতেন এবং এক নতুন বাস্তবতার জন্ম দিতেন, যাতে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতাধৃত বস্তুর অপ্রত্যক্ষণই রক্ষিত হতো। তাঁর বিখ্যাত 'জল দাও' কবিতার (দ্রষ্টব্য 'অন্বিষ্ট' কাব্য) বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, যেখানে প্রত্যক্ষ ঘটনাপুঞ্জের নিষ্কাশন ঘটেছে শিল্পের নির্যাসে স্নাত, পরিশুদ্ধ হয়ে এবং তার মধ্য দিয়েই কবিচেতনার রূপান্তর সাধিত হয়েছে ভিন্ন গতিশীলতায়।

লুকাচ যেমন কবিতার ভাষাকে দেখেছেন চিত্র ও সঙ্গীতের মতোই অন্যোন্য সম্পর্কের অন্বয়ে ও দোলাচলে নিষিক্ত থেকেও অনুষঙ্গ, স্মৃতি এবং সামাজিক তাৎক্ষণিক-তাৎপর্যে বিভূষিতরূপে, বিষ্ণু দেও সমমাত্রিক, বিশুদ্ধ মাধ্যম হিসেবে সঙ্গীতকে কাব্য-ভাষার স্মৃতি ও তাৎপর্যের পরিকাঠামোয় আবদ্ধ করেন। আর চিত্রকলার প্রতি তাঁর দুর্মর আবেগের তথ্য তো বিশেষ ভাবেই অবধানযোগ্য।

উদারতন্ত্রী মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের পোষক লুকাচ ছিলেন যেমন আদর্শ-নিষ্ঠ, মার্কসীয় মানবতাবাদে প্রত্যয়ী, তেমনি ছিলেন বৈচিত্র্যময় জীবনযাপনের মধ্যেও অভ্রান্ত, আত্মবিশ্বাসী। বিষ্ণু দের অনুরূপ বর্ণাঢ্য জীবনাভিজ্ঞতা না থাকলেও মার্কসবাদে অবিচল আস্থা রেখে তিনিও লুকাচের ন্যায় সারস্বত জীবন নির্বাহ করেছেন। সাহিত্যের মৌল আদর্শ, তার কালজয়ী সর্বজনীনতা, বিশ্ববোধ এবং নির্দিষ্ট আর্থনীতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক থেকে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও সাহিত্যের আপেক্ষিক স্বায়ত্তশাসনের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছিলেন লুকাচ। তাঁর দৃষ্টিকোণে মহৎ ও খাঁটি মানবতাবাদের সম্পর্ক সর্বদাই অঙ্গাঙ্গিভাবে ঐক্যবদ্ধ; আর এই ঐক্যবদ্ধতার পশ্চাতে রয়েছে 'মানুষের সততাকে' রক্ষা করবার জন্য প্রকৃত উদ্বেগ ও সততা। লুকাচের মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের মূলকাঠামোই দাঁড়িয়ে আছে এই মানবতাবাদী প্রীতিসূত্রের উপর, যেমন করে মার্কসের দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্বটি বিরোধিতা করছে সূত্রবদ্ধ, স্থূল, অবাস্তব, যান্ত্রিক জড়বাদকে। সেখানে বিরোধিতার সূত্রটা হচ্ছে এই মানবতাবাদ এবং মানুষ যে আত্মবোধসম্পন্ন সত্তা এই ধারণা এবং সে যে

একইসঙ্গে ইতিহাসেরও অঙ্গ এই প্রত্যয়। আবার শুধুই প্রয়োজনের দাসত্বে এই সত্তা বন্দী নয়, বরং তার ধর্মই হল অসীমকে খুঁজে বেড়ানো।

বিষ্ণু দের দৃষ্টিলোক ও নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাদর্শে এরকম একটি মানবতাবাদী প্রীতির উৎস আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। তাছাড়া দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের তর্কবিতর্কে না গিয়ে তিনি অবলম্বন করেছেন মার্কসীয় মানবতাবাদকে; ব্যক্তিত্বের বাধামুক্ত বিকাশের প্রকল্পরচনায় থেকেছেন সৎ ও অন্তর্নিবিষ্ট। সামঞ্জস্যের আরও ক্ষেত্র খুঁজলে দেখা যাবে বিষ্ণু দেও আত্ম-সচেতনতার প্রকাশকে শিল্পের প্রাথমিক দায় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এবং আধারের মতোই আধেয়কে ভেবেছেন সমগুরুত্বপূর্ণ। প্রথম পর্যায়ে তাঁর মানসজগতে যে আত্মতার সংকট বা ব্যক্তিক প্রতিচ্ছবি চিত্রণের ঝোঁক প্রবল ছিল, তা পরিবর্তিত হয়ে কবিতায় প্রবিষ্ট হতে থাকে এক আত্মসচেতন সজ্ঞান মনের ব্যক্তিস্বরূপকে অনুধাবনের ঐতিহাসিক পদ্ধতির সূত্রাবলী, এলিয়েনেশনের তত্ত্ব ও স্বপ্নবিশ্বের বিনির্মাণ।

জার্মান মার্কসবাদী থিয়োডর এডরনো (১৯০৩-৬৯) লুকাচ-অনুসৃত ধারায় সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে নন্দনতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তাঁর চিন্তায় বস্তুগত জীবনের গুণাত্মক বিবর্তনের নকশাটি বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। তিনি শিল্পকে তার বাহ্যিক উপাদানের মধ্যে সন্ধান না করে খুঁজতে চেয়েছেন সেই নিহিত নিয়মের মধ্যে, যেখানে উপাদানের অর্থ পরিবর্তিত হয় বিশেষ মুহূর্তের দ্বন্দ্বে এবং এ-অর্থে বাস্তবতার দুটো অবস্থানকে সক্রিয়, দ্বন্দ্বরত অবস্থায় বিশ্লেষণ করেন। অনুরূপ দ্বৈত-অবস্থান বিষ্ণু দের কবিতায় সর্বদাই উপস্থাপিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, থিয়োডর এডরনোর ব্যাখ্যাত দায়বদ্ধতা বা শিল্পসম্পর্কিত ভাবনার আনুক্রমিক সন্ধান তাঁর ক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।[১৮] এডরনো দায়বদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রে তথাকথিত যান্ত্রিক দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন নি, তাঁর মতে, শিল্প কাজ করবে একেবারে আদিতে— মূল মনোভাবের অভ্যন্তরে, প্রচলমতের উদ্দেশ্যমূলক শিল্পরচনা থেকে এই কাজ পৃথক। লেখক যে দায় অঙ্গীকার করেন তাদের স্ব স্ব লেখার মূলে— বিশেষত একজন মার্কসবাদী লেখক, তা কোন নির্বাচনের বিষয় নয়, এই দায়বদ্ধতা প্রকৃত অর্থে সারসত্যের দায়, যা অবশ্যম্ভাবী একটি শক্তি।[১০] বিষ্ণু দেও পার্টি-বহির্ভূত অবস্থানে থেকেও উক্ত সারসত্যের দায়বোধ থেকেই প্রগতির স্বপক্ষে মানবতাবাদকে রূপান্তরিত করে গেছেন।

এডরনো পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করেছেন যন্ত্রণার দাবীর কথা; এই যন্ত্রণা শিল্পের অস্তিত্বকে অবিচ্ছিন্ন রাখে। বিষ্ণু দের কবিমানসে যন্ত্রণার উৎসারণ একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপাদ্যের মতোই সর্বদা ক্রিয়াশীল, যেখানে আমরা তাঁর কবিকণ্ঠস্বরের স্বকীয় স্বরগ্রামকে চিনে নিতে পারি এবং তাকে তাৎক্ষণিক না ভেবে চিরায়ত ও বহুআয়তন–বিশিষ্ট হিসেবে ভাবতে পারি। এডরনোর মতোই বিষ্ণু দে শিল্পীর স্বাধীন দায় ও শুদ্ধ অধিকারের প্রশ্নে আপসহীন থাকেন এবং বাস্তবকে কিভাবে কাব্যগত করবেন সে জিজ্ঞাসায়ও থেকেছেন শিল্পীর স্বাধিকারত্বে অবিচল। মার্কসীয় দর্শনের যে ডায়ালেকটিক, তাকে বিষ্ণু দে সর্বদাই একটি বিপরীত প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়ে বিষয়াকারে ধারণ করেছেন। ফলে কখনও কখনও তাঁর রচনাক্রিয়া হয়ে উঠেছে দ্বৈতাদ্বৈতের সংঘাতে পরিপূর্ণ। এবং এই সংঘাতের মধ্যেই মানবসম্বন্ধের—তার জাগতিক ও সামাজিক বিকাশকে নান্দনিক রূপমূর্তি দিতে চেয়েছেন।

এডরনোর আরেকটি ধারণা ছিল এই যে. প্রত্যেকটি শিল্পকর্মের যুক্তিশৃঙ্খলাধীন একটি সাংগঠনিক ও সামগ্রিক নীতি রয়েছে। শিল্পকর্ম তার যন্ত্রণার সমস্যা ও প্রতিবাদের গর্ভে উক্ত যুক্তি–শৃঙ্খলার ন্যায়কে সপ্রতিষ্ঠ রাখে। বিষ্ণু দের কবিমানসের মধ্যে রয়েছে এই দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের বন্ধন —যা তাঁর কবিতাকে একইসঙ্গে প্রদান করে সামগ্রিকতার অন্বয়বোধ। তাঁর কাব্যকাঠামো, স্তবকপরম্পরা এমনকি বাক্যবন্ধে পর্যন্ত উক্ত দ্বান্দ্বিকতা অস্তিত্বশীল; এমনকি বিরাজমান তাঁর ইমেজ তৈরীর করণকৌশলেও। সবকিছু মিলিয়ে তিনি এমন একটি দ্বান্দ্বিকতার অবয়ব গড়ে তোলেন, যেখানে বিচ্ছুরিত হয় ধ্বংস, মৃত্যু, অন্ধকারের মধ্যেও নিহিত মুক্তির বিভা। এ অর্থেই বিষ্ণু দে যতোটা মনন আরোপ করেন কবিতায়, তারও বেশি রাজনৈতিক–সামাজিক অবস্থা ও কার্যকারণের ঝোঁক চাপিয়ে দেন, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, রাজনীতিতেও যা চলে না, কবিতার হাতে যেন আজ সেই বিশেষ দায়িত্ব এসে পড়েছে–যার বাইরে কবিতা যেতে পারছে না।

এডরনোর সঙ্গে বিষ্ণু দের প্রতিতুলনার নানা ক্ষেত্র রয়েছে, যেমন ব্রেখট ও হাক্সলী সম্পর্কে উভয়ের ব্যাখ্যা; কাফকা–জয়েস–প্রুস্ত সম্পর্কে আলোচনা, ব্রেখটের *Of Poor B. B.* কবিতার দৃষ্টান্ত ব্যবহার ইত্যাদি।[২০] তবে উভয়ের মধ্যে পৃথক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। এডরনো রাশিয়ার কঠোর সমালোচক, বিষ্ণু দে রাশিয়া সম্পর্কে সর্বদাই উচ্ছ্বসিত;

যদিও চল্লিশের দশকে রাশিয়ার ঝদানভের নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করেছেন এবং বিপরীতে ফ্রান্সের গারোদির মতে সমর্থন প্রদান করেন। এমনকি বরিস পাস্তেরনাককে বিষ্ণু দে যে–অর্থে সমালোচনা করেন, তাতে রাশিয়ার বিরুদ্ধাচারণ ব্যক্ত হয় না, বরং পাস্তেরনাকের ব্যক্তি–বিশ্বে বিশ্বদর্শনের অভাবের দিকটাই তুলে ধরতে চান। ফ্যাসিবাদী অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত এডরনোর দৃষ্টিলোক রাশিয়ার প্রতি বিমুগ্ধ থাকার কার্য–কারণে আবদ্ধ নয়, এই প্রেক্ষাপট বিষ্ণু দের ক্ষেত্রে নেই। ফলে উভয়ের সাযুজ্য কেবলই নান্দনিক বোধের ক্ষেত্রে যতোটা প্রবল, ততোটাই ন্যূন বাস্তব প্রতিবেশের সূত্রে।

ইতালীয় মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও নেতা আন্তোনিও গ্রামসির মতাদর্শের সঙ্গেও বিষ্ণু দের সাহমর্ম অনুসন্ধেয়। প্রসঙ্গত তিনি নিজেই প্রবন্ধে[২১], চিঠিতে[২২] গ্রামসির গ্রন্থ পঠনপাঠনের উল্লেখ করেন। এই কমিউনিস্ট নেতা লেনিনের পর প্রথমবারের মতো উপরি–কাঠামো তথা সংস্কৃতি যে অবকাঠামোকে প্রভাবিত করে— এই তত্ত্বটিকে স্পষ্টতা ও দৃঢ়তা দেন। প্রাতিষ্ঠানিক সাংস্কৃতিক কাঠামো আর উপরিকাঠামোর অন্যান্য দিক সম্পর্কে তার মতাদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে মুসোলিনীর ফ্যাসিস্ট কারাগারে বসে রচিত *Prison Notes-books*- এ।[২৩] উপরিকাঠামোর প্রতি বিশেষ ঝোঁক থাকলেও গ্রামসি মার্কসীয় মূল প্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হন নি; যেমনটি লক্ষ্যযোগ্য কবি বিষ্ণু দের ক্ষেত্রেও। শিল্প–সংস্কৃতির সক্রিয় ও কার্যকর প্রভাব ব্যাখ্যায় তিনি বারংবার একে একটি বাস্তবতা হিসেবে দেখেছেন এবং এই বাস্তবতা যে মূর্ত, দ্বান্দ্বিক গতিবিশিষ্ট, তা বিশেষভাবেই ব্যক্ত করেন। বিষ্ণু দে বাস্তবতার দ্বান্দ্বিক ন্যায়কে কবিতার অবয়বে ধারণ করেও উপরিকাঠামোর সেই প্রভাবকে সার্বভৌম ভাবেন, যে–অর্থে বিপ্লবের জন্য অনিবার্য হয় ওঠে সাংস্কৃতিক ও মতাদর্শগত প্রস্তুতি, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের অপরিহার্য অস্তিত্ব। নতুন সমাজগঠনের লক্ষ্যে নতুন ধরনের বুদ্ধিজীবীও প্রয়োজন, এ সত্যই তাঁর 'অন্বিষ্ট' কাব্য থেকে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থ পর্যন্ত প্রসারিত। এই সব বুদ্ধিজীবী হবে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর তত্ত্ব ও মতাদর্শের ধারক, যেমন গ্রামসি বলেন এই "Critically self-conciousness means histrically and politically, the creation of an 'elite' of intellectuals. A human mass does not distinguish itself, does not become independent in its own right without in the widest sense,

organising itself, and there is no organization without intellectuals; that is without organisers and leaders..."[২৪] বিষ্ণু দেও অনুরূপভাবে ভারতবর্ষীয় বাঙালী মধ্যবিত্তের মধ্যে এলিটদের সন্ধান করেছেন তাঁর Marx and Bengali Writing নামক প্রবন্ধে।[২৫] এখানে গ্রামসি কথিত traditional intellegentia-র প্রতি বিষ্ণু দের মন্তব্য বিশ্লেষণধর্মী। তিনি নতুন মতাদর্শ-ভিত্তি গঠনের লক্ষ্যে প্রথমেই পূর্বের আদর্শগত শৃঙ্খলগুলো ভাঙার তাৎপর্য অনুভব করেছেন, যাতে সহজেই নতুন শক্তিগুলো নিজস্ব স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ ও জায়মান হতে পারে। এ ভাঙার কাব্য হচ্ছে 'পূর্বলেখ', 'সন্দ্বীপের চর', 'অন্বিষ্ট'। একই সঙ্গে এখানে গড়তে চেয়েছেন নতুন মতাদর্শগত ঐক্যমালা, সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণার অপরিহার্যতা। এর পেছনে সক্রিয় ছিল এই বোধ যে, যেহেতু জীবনের সর্বত্র সভ্যতার নব্যদিগন্ত প্রসৃত হচ্ছে, সেহেতু বুদ্ধিজীবী ও ক্রমবর্ধমান জনগণের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সংযোগের ঐক্যও হবে পুনর্বার নির্ধারিত। এক্ষেত্রে ঐতিহ্যিক বুদ্ধিজীবীদের যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে তিনি স্বীকৃতি দেন, তেমনি স্বকালের স্বসমাজের বুদ্ধিজীবী বন্ধুজনদেরও সমষ্টিবাচকতায় ধারণ করেন (দ্রষ্টব্য 'পূর্বলেখ' কাব্যের কবিতা-উৎসর্গের মাল্যবন্ধন)। অন্যদিকে তিনি গ্রামসির মতোই শ্রমজীবীর মধ্যে অপ্রতিরোধ শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেন, যদিও গ্রামসির মতো তাঁর নেই বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতা। তথাপি বিষ্ণু দে আমৃত্যু নিজের ও শিল্পের অস্তিত্বের প্রশ্নে, বেঁচে থাকার তাৎপর্যে প্রগতিশীল পক্ষেই অবস্থান গ্রহণ করেছেন; আত্মসচেতনতায় ভাবীজীবনের ছন্দস্পন্দনকে চৈতন্যে জাগরূক রেখেছেন; ঔদাসীন্যকে অবহেলা করে শিল্পরচনায় থেকেছেন সচল।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে শিল্পী—সাহিত্যিক : বিষ্ণু দের অবস্থান

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতোমধ্যে ক্রমবর্ধমান ফ্যাসিবাদের প্রসার রোধের জন্য বিশ্বের মানবতাবাদী শিল্পী ও চিন্তাবিদগণ সচেতন ও তৎপর হয়ে উঠছিলেন। বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের ভস্মগর্ভেই উপ্ত হয়েছিল দ্বিতীয় আরেকটি যুদ্ধের সম্ভাবনা, যার ফ্যাসিবাদীরূপের অঙ্কুরোগমকে প্রথম নিরীক্ষণ করলেন বিবেকবান শিল্পী-সাহিত্যিকগণ। তিরিশ দশকের প্রারম্ভেই তাঁরা ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন ফ্যাসিবাদ বিস্তারের ক্রমগতিকে রুখবার জন্য। প্রথম দিকে বিভিন্ন শান্তি সম্মেলনের আকারে তাদের

যুদ্ধবিরোধী চেতনার ঘনীভবন ঘটতে থাকে, এর সূত্রপাত হয় ১৯৩১ সালে জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া দখলের প্রতিবাদ–স্বরূপ ২৭–২৮এ আগস্ট ১৯৩২–এ অনুষ্ঠিত আমস্টারডামের বিশ্ব–শান্তি সম্মেলনে। আঁরি বারবুস ও রোমাঁ রোলাঁর নেতৃত্বাধীন এই সম্মেলনই পরবর্তী ধাপে ফ্যাসিবিরোধী কার্যক্রমে পরিব্যাপ্তি লাভ করে। ১৯৩৫ সালের ২১–এ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত হল শিল্পী–সাহিত্যিক–বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ–বিরোধী প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পৃথিবীর বরেণ্য কবি সাহিত্যিক ও মনীষীরা এতে যোগদান করেন এবং ফ্যাসিস্ট বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবজাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। এদিকে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি, ভীতি প্রদর্শন, জবরদস্তি এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি লংঘন করার পর ইতালী ১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর আবিসিনিয়া আক্রমণ করে। আবিসিনিয়ার পতনের ফলে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিজয় অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে 'লীগ এগেইনেস্ট ফ্যাসিজম এন্ড ওয়ার' সংস্থার আহ্বানে শান্তিকামী ও প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ব্রাসেলসে বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষে একত্রিত হন। এই বিশ্বসংস্থার সঙ্গে সৌহার্দ্যমূলক ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলায় উক্ত সংঘের একটি আঞ্চলিক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে। এর পক্ষ থেকে ব্রাসেলস্–এর শান্তিসম্মেলনে ফ্যাসিজম ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়।

১৯৪১ সালের জুন মাসে ইউরোপ–বিজয়ী জার্মানবাহিনী রাশিয়া আক্রমণ করলে বৃটেনের সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এদিকে জাপানও দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ আক্রমণ করতে শুরু করে। এর ফলে যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের রূপ নেয় এবং ইউরোপ–এশিয়ার ফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। এই মৈত্রীর মধ্য দিয়ে ফ্যাসিস্ট আক্রমণে পদানত ও আক্রমণ–আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত পৃথিবীর জনগণের মধ্যে ফ্যাসিস্ট–বিরোধী মৈত্রী গড়ে ওঠে।

এসব আন্তর্জাতিক আগ্রাসন ও মৈত্রীবোধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মার্কসবাদী কবি–সাহিত্যিকগণ নিজেদের সক্রিয়তা সম্প্রসারিত করেন। যদিও তিরিশের দশকে এদেশের ফ্যাসিবিরোধী লেখকগণ ইংরেজ মার্কসবাদী লেখকদের অনুরাগী ছিলেন; এ্যালিক ওয়েস্ট, জেরোম কে জেরোম, কর্ণফোর্থ, জর্জ টমসন প্রমুখের সাহিত্য–সংস্কৃতি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা ও

সাহিত্যালোচনার ধারাই এদেশের বুদ্ধিজীবীর চিন্তায় গৃহীত হয়েছিল। ১৯৪২ সালের ২৮–এ মার্চ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট–বিরোধী লেখক সম্মেলনে সংগঠিত 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী'র যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ যুগে বিষ্ণু দের অধিকাংশ লেখা প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'অরণি' পত্রিকায় এবং কবিতা, অনুবাদ কবিতা, প্রবন্ধ ও সাহিত্য–সমালোচনা বিষয়ে তিনি প্রচুর লিখতে থাকেন। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, এই প্রথম ও শেষবারের মতো তিনি সামাজিক–রাজনৈতিক সক্রিয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪২ সালে প্রচার পুস্তিকার ঢংয়ে প্রকাশ করেন '২২শে জুন' কাব্য, প্রকাশক ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ, কলকাতা। পুস্তিকাটিতে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি ছাপা ছিল যে, 'এই বই–এর লভ্যাংশ ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের প্রাপ্য।' এছাড়াও অনুবাদ গল্প 'সমুদ্রের মৌন'[২৬] থেকে শুরু করে নানা ফ্যাসিবিরোধী গল্প–কবিতার অনুবাদ করেন, যেমন হারুন তাজিয়েফের নাৎসীবিরোধী ফরাসী গল্পের অনুবাদ 'নির্বাহ' [২৭], শিল্পী–সাহিত্যিকদের সামাজিক দায়িত্ব ও সক্রিয়তা–বিষয়ক চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ রচনা,[২৮] এমনকি ফ্যাসিবাদ–বিরোধী আন্দোলনের জন্য চাঁদা সংগ্রহার্থে নাট্যাভিনয়ের আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।[২৯] ১৯৪৫ সাল নাগাদ ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের উদ্যোগে এই নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আশুতোষ কলেজে। এতে বিষ্ণু দে ইয়েটসের Resurrection কাব্য–নাট্যটির সুধীন্দ্রনাথ দত্ত–কৃত অনুবাদ "পুনরুজ্জীবনের" মহড়া পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছিলেন। এ ছাড়াও ভারতীয় গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য বিষ্ণু দে বোম্বাই যান।

আন্তর্জাতিক বিশ্বের এই ফ্যাসিজমের মধ্যে পৃথিবীব্যাপী যে মৈত্রীর সূচনা ও প্রগতির উদ্দীপনা জাগে, তা বিষ্ণু দের জীবনে বাস্তবঅর্থেই সক্রিয়তা সঞ্চারের প্রেরণা–উদ্দীপনায় পর্যবসিত হয়; এ জন্যেই তিনি নিজ জীবনে প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রভাবকে চিহ্নিত করেছেন 'ডাইরেকশন' হিসেবে। কেন না, ঐ রকম আন্তর্জাতিক ঘটনার পাশে স্বদেশের আন্দোলনগুলোও ছিল চিন্তা ও সক্রিয়তার একটা শক্তভিত–স্বরূপ। স্বয়ং কবির ভাষ্য "সাহিত্যিকরা গৌণ জীব হলেও, সাহিত্যিক–মানসেও তাই ছন্দ শব্দ অর্থাৎ অন্তরঙ্গ ভাষা হয়ে উঠতে লাগল একাধারে তীব্র এবং ব্যাপ্ত,

ব্যক্তিময়তা হতে লাগল একাধারে বিশুদ্ধতর, ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক এবং সেই হেতু বিশ্বজনীন, উপমারূপক হতে লাগল প্রতীক—সাঙ্গীতিক ও গাণিতিক বোধ হয় বিপরীত দুই অর্থেই, ভাষা যতই পেশীসচল ক্ষিপ্রসন্ধানী ততই প্রাকৃত দেশজ সাধারণ্যের নিহিত ভাষার ছন্দে বিদগ্ধ, জটিল, পুরুষার্থে সবল, সুস্থ।" ৩০ এই সময় থেকেই বিষ্ণু দে এলিয়ট–চর্চার বাইরে পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক কবিদের মধ্যে ফরাসী সাম্যবাদী কবি পল এলুয়ার ও লুই আরাগঁ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেন।৩১ তবে এলিয়টও দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের সূত্রে কবির চৈতন্যে বিধৃত থাকেন— "এলিয়টের মহাপ্রস্থান" (১৯৪৪) নামক আলোচনাটি তার স্বাক্ষর।

বিষ্ণু দের এই সময়কার সক্রিয়তা ও মানসিক ভাবাবহ সম্পর্কে সমালোচকগণ প্রগাঢ় মন্তব্য করেছেন। অরুণ সেনের মন্তব্য, "—পরিগ্রহণের নিরন্তরতায় তিনি নৈরাত্ম্যরীতির পরোক্ষতাকে মিলিয়ে দিচ্ছিলেন সমাজকর্মের সক্রিয়তায় অংশগ্রহণের ও সহানুভূতিতে প্রত্যক্ষতার আবেগকে।"৩২

দেবেশ রায়ের ভাষ্য, "হিটলারের রাশিয়া আক্রমণের ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বদলে যায় জনযুদ্ধে। দেশকে জানার আত্মদীর্ণ প্রক্রিয়া গিয়ে মেশে ইতিহাসের সমসাময়িকের প্রচণ্ড জীবনে। 'পূর্বলেখ'তে যে জানা ছিল ইতিহাসে, সেই জানা বদলে যায় '২২শে জুন', 'সাত ভাই চম্পা'তে দুনিয়ার বদলটা চোখের সামনে যেখানে ঘটছে। কলোনির দেড়–দুশ বৎসরের গ্লানির ভার অবান্তর হয়ে যায় বিশ্বের শ্রমিকশ্রেণীর অভূতপূর্ব ভূমিকায়। --- আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর উপমায় বিষ্ণু দে তাঁর দেশকে আবিষ্কার করেছিলেন, সেই দেশ–আবিষ্কার আর কবিত্বের আত্ম আবিষ্কার একই উদ্বোধনে ঘটেছিল। সেই উদ্বোধন তাঁর জীবনব্যাপী কবিতা–কর্মে কখনোই আর ভোলা গেল না।"৩৩ অর্থাৎ বিষ্ণু দের স্বকীয় কণ্ঠস্বর আবিষ্কার, নৈরাত্ম্যরীতির মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঞ্চার এবং সর্বোপরি মার্কসীয় তত্ত্বে দৃঢ়মূল হওয়ার ক্রিয়াশীলতা এসব বাস্তব ঘটনার মধ্য দিয়েই ঘটছিল। আরও লক্ষণীয়, অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে আদর্শগত প্রশ্নে মতান্তরের সূচনা, যদিও সাহিত্যিক আড্ডা, এলিয়ট প্রসঙ্গ ও 'পরিচয়' পত্রিকার আবহাওয়ায় উভয়ের মধ্যে যে মৈত্রীবন্ধন গড়ে উঠেছিল তা মূলত মত ও পথের স্বভাবসিদ্ধ বৈপরীত্যবোধে আক্রান্ত ছিল। রবীন্দ্রনাথের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ, কবিতায় আধুনিক আত্মসচেতনতা ও পরিশ্রমের স্বীকৃতিদান এবং বিশেষত বিদেশী সাহিত্য পঠনপাঠনের সূত্রে দুই

কবির যে-অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল তিরিশের কবিতায় তার একটি ঐতিহাসিক ও নান্দনিক ভূমিকা রয়েছে। প্রাথমিক পর্বে দু'জনেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার নির্মাণ পদ্ধতির প্রকরণ-শৃঙ্খলা ভেঙে আধুনিক রূপবৈচিত্র্যের জন্ম দিতে চেয়েছিলেন, যে "আধুনিক মানুষ বাস করছে একটি বিস্ময়কর অসম্ভাবের মধ্যে এবং গুণবাচক বস্তুর অভাবজনিত শূন্যতার মধ্যে। আধুনিক মানুষের এই ভাগ্যলিপিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর কবিতায় প্রতিচিত্রিত করেছেন। কিন্তু কবিতার নির্মাণ-পদ্ধতির মধ্যে তিনি বিশেষ কোন পরিবর্তন আনেন নি। সে পরিবর্তনের দায়িত্ব পড়েছিল বিষ্ণু দের ওপর। বিষ্ণু দে প্রচলিত যুক্তিধারাকে বর্জন করলেন এবং আত্মভাষণের জন্য একটি তীর্যক ভঙ্গীকে অবলম্বন করলেন।"[৩৪] এই জীবনদর্শনের ভিন্ন পথ ও কবিতার প্রকরণ বৈশিষ্ট্যের সুগভীর পার্থক্যই উভয় কবির মধ্যে বিচ্ছেদ তৈরি করে। বিষ্ণু দে ক্রমেই মার্কসবাদে স্থিত হতে থাকেন। কিন্তু ফ্যাসিস্টবিরোধী মনোভাব গভীর হওয়া সত্ত্বেও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কমিউনিস্টদের পন্থা সম্পর্কে আস্থা হারিয়ে ফেলেন। বিশেষত রাশিয়ার ফিনল্যান্ড আক্রমণ তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। হিটলারের সঙ্গে স্ট্যালিনের চুক্তি তাঁকে আরও বিচলিত করে। তিনি তৎকালীন বাঙালী মার্কসবাদীদের এ সম্পর্কিত কোন যুক্তিই মানেন নি। "এই সময় বিষ্ণু দের সঙ্গেও কবিতা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক মত পার্থক্যের সূত্রে কখনও কখনও তর্ক ঘটে যায়। ক্রমশঃ দূরত্ব বাড়তে থাকে।"[৩৫] ১৯৩৯ সালেই বিষ্ণু দে সুধীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ গ্রন্থ 'স্বগত'-এর সমালোচনার মধ্য দিয়ে বিপরীত মত প্রকাশ করেছিলেন।[৩৬] এই সমালোচনায় তিনি সুধীন্দ্রনাথের যুক্তিসর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানান। তবে বিষ্ণু দে আজীবন এই অগ্রজ কবির কবিতার 'পরিশীলিত প্রজ্ঞা ও পরিশ্রম'কে শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছেন। বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি ও সাহিত্য আলোচনার বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিষ্ণু দের দীর্ঘকাল আন্তরিক যোগাযোগ ছিল।[৩৭]

১৯৪২ সালের আগস্ট-সংগ্রাম কলকাতায় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূত্রপাত ঘটায়। সারা দেশব্যাপী জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত এই সংগ্রাম যথাযথ নেতৃত্বের অভাবে ও প্রস্তুতির ন্যূনতায় ব্যর্থ হলেও দেশীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব রয়ে যায়। প্রভাবটি হল, নতুন করে ব্যাপক গণসংগ্রামের ভিত রচনা। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং সারা ভারতব্যাপী একই সঙ্গে শুরু হয় নৌ-বিদ্রোহ, ডাক-তার ধর্মঘট, হায়দ্রাবাদ-কাশ্মীর-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে প্রতিবাদ, তেলেঙ্গানা কৃষকসংগ্রাম, সর্বোপরি বাংলাদেশের বি্যাত তেভাগা

আন্দোলন–একই সঙ্গে মনুষ্যত্বের অবমাননা ও জয়ের ঘটনা। কবির অভিজ্ঞতায় এসব ঘটনা–ভাবাবহ এক ধরনের বিস্তার–ধর্মী অথচ সংবৃত আবেগের সূত্রপাত ঘটায় এবং কবিতার অনুসঙ্গী হয়ে ওঠে। 'সন্দ্বীপের চর' (১৯৪৪–৪৭) কাব্যে এর প্রতিফলন ঘটে দীর্ঘ এক আঙ্গিক ভাবনায়। বিশেষত, বিরুদ্ধ পরিবেশে, দুর্ভিক্ষের অকাল মৃত্যু আর শোষণ, লোভ আর অনাচারের পরিব্যাপ্তির মধ্যে ইতিহাসের প্রগতি সম্পর্কে অটুট আস্থার সঞ্জীবনী সন্ধানে বিষ্ণু দে মানবতার ঐতিহ্য সামগ্রীতে নিবিষ্ট হতে থাকেন; প্রকৃতির রূপকে–উপমায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ফলে একদিকে তার কবিতা জীবন, প্রেম ও প্রকৃতির সংগ্রামী তাৎপর্যকে প্রোজ্জ্বল করেছে, অন্যদিকে দেশী–বিদেশী সাহিত্য–সঙ্গীত–শিল্পকলার ঐতিহ্য রূপকথা–পুরাণের পটভূমি এবং সে সঙ্গে 'দার্শনিক প্রতর্কের' জটিল বিশ্লেষণে নিয়োজিত থেকেছে। এসবেরই প্রাক্কালে বিষ্ণু দের চেতনায় ও জীবনে এক অবশ্যম্ভাবী বাস্তব সংকট দেখা দিল। সেটা হচ্ছে, কমিউনিস্ট বুদ্ধিজীবী ও সহকর্মী বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শগত বিরোধ। সে ইতিহাস এদেশের চিন্তাধারায় ও বুদ্ধিজীবী মননে মার্কসীয় তত্ত্ব সম্পর্কিত জটিলতা ও দ্বন্দ্বময় ইতিহাসের সঙ্গে সংযুক্ত।

মার্কসবাদী সাহিত্য–বিতর্ক: বিষ্ণু দের স্বকীয় তত্ত্ব–সংগঠন

বিশ থেকে তিরিশ দশকের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষিত আদর্শবাদী তরুণ সম্প্রদায়ের উপর ছিল 'যুগান্তর', 'অনুশীলন' প্রভৃতি বিপ্লববাদী দলের প্রচণ্ড প্রভাব। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার পর বিশেষ করে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের (১৯৩০) পরবর্তী বছরগুলোতেই বাংলা ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যে অবস্থিত জেলখানায়, বন্দী শিবিরে এবং আন্দামানে নির্বাসিত তরুণ বিপ্লবীদের একটি বড় অংশ মার্কসবাদে আকৃষ্ট হতে থাকেন।[৩৮] তিরিশ দশকের শেষ ভাগে এরা মুক্তি পেয়ে যোগ দেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে। এসব তরুণদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন গোপাল হালদার, রেবতী বর্মণ, ভবানী সেন, সরোজ আচার্য প্রমুখ। এছাড়া অন্যান্য মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী— যারা শিল্প–সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনে মার্কসীয় ভাবধারার অনুশীলন করছিলেন, তাদেরও অভ্যুদয় ঘটেছে তিরিশ থেকে চল্লিশের দশকে।

মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণে শিল্পসাহিত্য বিচারের একটা প্রয়াস গড়ে উঠতে থাকে ১৯৩১–৩২ সাল থেকেই এবং পরবর্তী বছরগুলোতে সে–প্রয়াস ব্যাপক রূপ নিতে থাকে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই সর্বপ্রথম মার্কসীয় যুক্তি–বিজ্ঞানে বিশ্বাসী কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেও মার্কসীয় পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন না। 'পরিচয় গোষ্ঠীর' আদিযুগের লেখক, "যাঁরা পরবর্তীকালে প্রগতিসাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ অথবা অনুরাগী সহযাত্রীরূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, তাঁরাও ছিলেন নানা মানসিকতা ও ভাবগঙ্গায় সঞ্চরণশীল। তবু এঁদের অনেকের মুক্তবুদ্ধি চেতনার ফলে প্রথমাবধি 'পরিচয়'–এর পৃষ্ঠায় 'রুষ বিপ্লবের পটভূমি', 'রুষ বিপ্লবের ইতিবৃত্ত' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।" [৩৯] তবে এ সময় সাহিত্য–সংস্কৃতি বিচারে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের একটি অস্পষ্টরূপই প্রকাশ পেয়েছিল লেখকদের রচনায়, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণেই সাহিত্য–ভাবনায় মার্কসীয় দর্শন প্রবিষ্ট হচ্ছিল। তবে মধ্যতিরিশ থেকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ঘটনাবলী বুদ্ধিজীবীদের একত্রিত করতে থাকে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবজগতের সেতুবন্ধ গড়ে উঠতে থাকে নানাবিধ সংঘ স্থাপন, পত্রিকা প্রকাশ ও সম্মেলন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ১৯৩৭–৩৮ সালের মধ্যে বহু বিপ্লবী—যারা বন্দীজীবনে মার্কসীয় তত্ত্বে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তারা এসব সম্মেলনে ও সংঘে যোগদান করে এর শক্তিবৃদ্ধিতে তৎপর হন। এতে বাংলার প্রগতি ও সংস্কৃতি একসূত্রে বাঁধা পড়ে এবং কর্মচঞ্চল স্রোতধারার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় চিন্তাদর্শের প্রসার ঘটতে থাকে।

ফ্যাসিবাদ–বিরোধী আন্দোলন ও এর ইতিবাচক ফল

চল্লিশের দশকে বাংলাদেশের রাজনীতি–শিল্প–সংস্কৃতিতে ক্রিয়া–প্রতিক্রিয়ার দোলাচল, দ্বন্দ্ব–সংক্ষোভ ও বিপর্যয়ের ফলে ঐ প্রসূত–রূপটি নানারকম স্ববিরোধী বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বিশেষত ১৯৪২–৪৫ সালে ব্যাপক সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে মার্কসীয় চিন্তাদর্শের যে বলয় গড়ে উঠছিল, তার প্রভাব সমাজমানসে অনুভূত হতে থাকে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে বোম্বাই শহরে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হল প্রগতি লেখক সংঘের তৃতীয় সর্বভারতীয় সম্মেলন।[৪০] বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য শিল্পী–সাহিত্যিকদের সাথে বিষ্ণু দে এতে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালের

মার্চ মাসে পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় 'ফ্যাসিস্ট–বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'র ছয়দিন ব্যাপী বিরাট সম্মেলন। বিষ্ণু দে এতেও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ফ্যাসিবাদ–বিরোধী সংগ্রামের প্রাক্কালে যখন ফ্যাসিবাদ–বিরোধী সাহিত্যিক শিল্পী সম্মেলন এবং প্রগতি লেখক সংঘের সম্মেলন, ঘরোয়া সভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং এসব সংঘ–সম্মেলন থেকে গণনাট্য সংঘ (১৯৪৩), সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি (১৯৪১) ইত্যাদি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে, তখন থেকেই বিষ্ণু দের মধ্যে এসবের সামগ্রিক প্রভাববশত এক নতুন সাংস্কৃতিক বোধের উদ্বোধন লক্ষ করা গেল। নাগরিক বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্য অতিক্রম করে স্বদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির উৎস–উপাদান থেকে তিনি আহরণ করতে থাকেন কবিতা রচনার প্রাণবন্ত উপাদানসমূহ। বিশেষ করে 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের' ১৯৪৪ সালের দ্বিতীয় সম্মেলন উপলক্ষে গোটা দেশের লোকজীবনের সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত সজীব ধারাটি মুখর হয়ে উঠেছিল, "শিল্পীসাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের ফ্যাসিবাদ–বিরোধী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে নতুন সাংস্কৃতিক চেতনা পরিব্যাপ্ত হল নানা দিক দিয়ে তা তাৎপর্যপূর্ণ। এই সময় সৃষ্টিশীল শিল্পী–সাহিত্যিকেরা তাঁদের নাগরিক বিচ্ছিন্নতা অনেকখানি কাটিয়ে উঠে স্বদেশের লোকায়ত সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে আহরণ করতে চেষ্টা করেছেন সৃষ্টির প্রাণবন্ত সম্পদ, আবার নগর–সংস্কৃতির গণমুখী মানবিক বিষয়বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে বিধৃত করে তাঁরা পৌঁছে দিতে চেয়েছেন নিপীড়িত লোকমানসের কাছে।"[৪১] তৎকালীন 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় এই সম্মেলনের রিপোর্ট প্রসঙ্গে মন্তব্য করা হয়েছিল, "কলকাতায় এমন উৎসব আর হয় নাই। বিভিন্ন জেলা হইতে বিশিষ্ট শিল্পীর দল আসিয়াছেন, তাঁহারা কেহই শৌখিন গায়ক ও শিল্পী নন। শিল্প পদ্ধতি তাঁহাদের হাতে দেশপ্রেমের অস্ত্র হইয়া দেখা দিয়াছে। জনগণের জীবনের সঙ্গে ইঁহাদের যোগ প্রত্যক্ষ। তাই ইঁহাদের শিল্পকৌশল ব্যর্থ হয় নাই। দেশের সংস্কৃতি আজ ইঁহাদের আন্দোলনে নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে।"[৪২]

১৯৪৫ সালে ৩–৮ই মার্চ কলকাতার মহম্মদ আলী পার্কে অনুষ্ঠিত সম্মেলনটি আরও সফল ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এতে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিতে লোকসংস্কৃতির ধারাটিই প্রাধান্য পায়। এতে অংশগ্রহণ করেন কবিয়াল রমেশচন্দ্র শীল, শেখ গোমানী, উদাসী ফকির, সাহেব আলী, টগর অধিকারী, ফণী বড়ুয়া, রাইমোহন, নির্মল দাস, লম্বোদর

চক্রবর্তী প্রমুখ। কবিগানের লড়াই অনুষ্ঠানে "—কখনও ফ্যাসিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীক্ষ্ণ কষাঘাত, কখনও–বা স্বাধীনতা সংগ্রামের উদাত্ত আহ্বানে বিরাট জনসমুদ্রকে"[৪৩] গায়কেরা যেন একসূত্রে গ্রথিত করে দিয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘের জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র তাঁর সহযোগীসহ ১৮৬০ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এ সবেরই প্রবর্তনায় বিষ্ণু দের চৈতন্য–নির্মাণে ও নান্দনিক–বোধে "সামাজিক ঐক্য বা সমষ্টিবোধের নিশ্চিত ফল নির্দিষ্টতা" লাভ করে। 'কবিতা বা সংলাপের পদ্ধতি ও ফলের নির্দিষ্টতায়' লোকসঙ্গীতের অঙ্গীকার কবিতার টেকনিকে যাথার্থ্য খুঁজে পায়। শিল্পী যামিনী রায়ের মতো তিনিও সমাজচৈতন্যের প্রকাশ–রূপ খোঁজেন লোকমানসের সঙ্গীতফর্মে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে, বর্তমান শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যের প্রশ্নে 'লোকসাহিত্যেই পাওয়া যায় দীর্ঘ ও জটিল ঐতিহ্যের' পশরা। সবচেয়ে বড় ফলাফল হচ্ছে, ফ্যাসি–অবরোধ ও প্রতিরোধের সময় থেকে সাহিত্যে কমিটমেন্টের দৃঢ়তার প্রকাশ প্রবলতা পায়। প্রতিবাদী–মানসের সঠিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কে শিল্পী–সাহিত্যিকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুত 'কমিটমেন্ট' এবং 'এনলাইটমেন্টের' প্রশ্নটি চল্লিশের দশকের স্বাদেশিক–আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে আরও অনিবার্য হয়ে উঠবার ফলে কাব্যের ভাষা 'কমিটেড' কবিদের কাছে আরও ঋজুভঙ্গির প্রার্থনা করেছে ও প্রত্যাশিত ফল লাভও করেছে। এ যুগের অনেক কবিতা রচিত হয়েছে সময়ের অব্যবহিত চাপে ও তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে।[৪৪] সময়ের চাপ ও বাস্তবতা শিল্পীকে বাধ্য করে আরও বেশি মগ্নতা ও অংশগ্রহণে— সমাজের মূলভিতে, অন্তঃস্থলে পৌছনোর জন্য। এখান থেকেই শিল্পীর দায়বোধ জন্মায়। সচেতনতা আর শুধুমাত্র প্রতিজ্ঞা বা অভিপ্রায়ের স্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, তা সাহিত্যের গতি–প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে এই সময় শিল্পীর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে যেমন বেশ কিছু সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন [৪৫] , তেমনি লোকসঙ্গীত ও শিল্পকলার প্রবহমান ঐতিহ্য সম্পর্কেও নতুনভাবে ভাবিত হতে থাকেন। 'সাত ভাই চম্পা' কাব্যের রচনা (১৯৪১–৪৪) শুরু হয়েছিল ফ্যাসিবিরোধী চেতনা এবং তার সঙ্গে তৎকালীন দেশীয় রাজনীতির ও সংস্কৃতির বিভিন্ন আন্দোলনের অভিজ্ঞতাকে গ্রথিত করার মধ্য দিয়ে। এর ফলেই বিষ্ণু দের কবিতায় স্বদেশচেতনা পরিগৃহীত হয় একটি মূল 'থীম' রূপে, যদিও তৎকালীন অবস্থায় সে অভিজ্ঞতার ধরনটা ছিল বিপর্যয়কর–

বাংলার দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর উক্ত কাব্য-গ্রন্থে সরলতায় ও স্পষ্টতায় প্রতিবিম্বিত।

বস্তুত প্রগতি লেখক সংঘের বাস্তব ফলাফল খুব একটা দীর্ঘজীবী ছিল না। রাজনৈতিক সাধারণ লক্ষ্যবস্তু ছাড়া সেদিন ঐ প্রগতি সাহিত্য আন্দোলন কোন একটি সুস্পষ্ট ভাবাদর্শ বা সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে নি। নানা মতাবলম্বী লেখকের যে বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল, তা বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। সমগ্র বিষয়টির উপর আলোকপাত করলে বোঝা যায় যে, যে-রাজনীতি ঐ যুগে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সেটা ছিল সাম্যবাদী ভাবধারার বিকাশ; দেশে দেশে শ্রমজীবীর আন্দোলন, ফ্যাসিবিরোধী ঘৃণা ও সংগ্রামী প্রতিরোধ ইত্যাদি। এর ফলে কবিতার সঙ্গে আন্দোলনের প্রত্যক্ষতাকে বিমিশ্র করে কেউ কেউ নতুন একটি ধারার জন্ম দিতে চেয়েছিলেন; এ ধারাটির রূপরেখা ছিল সরল, স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আবেদনে অনুবদ্ধ। কিন্তু রাজনীতি সরল রাস্তা ছেড়ে যখন আঁকাবাঁকা ও কুটিল পথ নিতে লাগল, তখন দ্রুত বিশ্বাস ভঙ্গ হতে থাকে। ইউরোপেও এ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট রাইটারদের বহু কবি শিবির বদল করতে থাকেন, ফ্যাসিবিরোধীর সমাবেশ ক্রমে শূন্যতায় গিয়ে ঠেকে। এর কারণ বোধকরি এই যে, যেখানে সমাজবাস্তবতার সঙ্গে শিল্পের দায়বদ্ধতার প্রশ্ন শৈল্পিক সত্যের দ্বারা বিধৃত হয় না সেখানে আপাত-ঐক্য বেশিদিন স্থায়ী হয় না। তদুপরি শিল্পী-সাহিত্যিকের পক্ষে রাজনীতিকে বিষয় হিসেবে গ্রহণের প্রসঙ্গ আর বাস্তব জগতে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার শর্তাদি এক নয়, দায়বদ্ধতাকে শিল্পের আঙ্গিকে রূপ দেওয়ার ক্ষমতাও সুলভ বা সরল-রৈখিক নয়, বরং আপাত ও সরল-রৈখিক প্রচারের দ্বারা তা হাস্যকরই হয়ে ওঠে। এ কারণে ঐক্যবদ্ধ সাহিত্যচর্চার যে ধারা গড়ে উঠেছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতায়, তা ক্রমশ শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

তবে বিষ্ণু দের মানসজগতে এই সময়কার কর্মকান্ড ও প্রগতি আন্দোলনের সংঘবদ্ধ প্রয়াসটি ছিল অনুপ্রেরণামূলক ও ইতিবাচক। যার ফলে এ পর্বের কবিতায় গুণধর্মী সৃষ্টিশীলতা ও জীবনপ্রবাহের উন্মুখর-রূপটি লক্ষ করা যায়। অবক্ষয়ী শহুরে সংস্কৃতির বেড়াজাল অতিক্রম করে তিনি দেশজ ও লোকমানসের উৎসমূলে সৃজনশীল দৃষ্টি নিয়ে পৌছতে চাইলেন, 'ব্যক্তিগতের নিভৃতি থেকে সমষ্টিলোকের অনুভবে- ঐক্যে আধুনিকতার নতুন অর্থ খুঁজতে চাইলেন।

কবির চিত্ত—সংকট ও তার গতি—প্রকৃতি

সূচনা-পর্ব থেকে প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনকে নানাভাবে সহায়তা দান করলেও বিষ্ণু দে এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশ দশকে বিতর্কের বিষয়ে পরিণত হন। বিশেষ করে বিষ্ণু দে তাঁর 'অতিরিক্ত বুদ্ধিচর্চা আঙ্গিক-বিলাস ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবোধের কাব্যিক অভিব্যক্তির জন্য মার্কসবাদী পার্টিজানদের দ্বারা সমালোচিত ও ভৎর্সিত হন। তাঁর 'সাত ভাই চম্পা' কাব্যের ব্যাপক দেশজভিত্তিক উপাদান ও আঙ্গিকের সারল্য সত্ত্বেও তাঁর ক্ষেত্রে অভিযোগ ওঠে 'শুদ্ধাচারী শিল্পদৃষ্টি ও নাগরিক বৈদগ্ধ্যের জটিল মানসিকতার' ধারক হিসেবে। এই নাগরিক বৈদগ্ধ্য 'গণআন্দোলনমুখী সাহিত্য চেতনার' সরল ফর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বিশেষ করে মার্কসবাদী সমাজ-সাহিত্য সমালোচক বিনয় ঘোষ 'নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা' (১৯৪০) গ্রন্থে "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা" নামক প্রবন্ধে অন্যান্য আধুনিক কবির সঙ্গে বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন।[৪৬] তাঁর তীক্ষ্ণ মন্তব্য, "এঁরা সকলেই প্রায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত পণ্ডিত অধ্যাপক, পৃথিবীর হালচাল ভালভাবে জানেন, এবং নিভৃতে মনীষা-সাধন করাই এঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। এঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে দেশের বাকি সব মানুষকে এঁরা অপোগণ্ড ও মূর্খ ভাবেন, সুতরাং এঁরা যা কিছু রচনা করেন তা শুধু গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দের জন্য"।[৪৭] বিনয় ঘোষের সঙ্গে আরও কিছু সংখ্যক মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বিষ্ণু দের কবিদৃষ্টির আভিজাত্য নিয়ে তীব্র সমালোচনা করতে থাকেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, অনিল কাঞ্জিলাল প্রমুখ। বিষ্ণু দের পক্ষে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; তাঁর স্মৃতিচারণ "মজলিশে জমে না যাওয়া পর্যন্ত একটু যেন দূরাবস্থিত, ভিন্নগোত্র, পরিপাটি ধারালো মানুষ হিসেবে বিষ্ণু দে বাবু কখনো ঠিক 'জনপ্রিয়' ছিলেন না। পার্টি মহলে (পরবর্তীকালে গবেষক বলে পরিচিত) বিনয় ঘোষ প্রভৃতি বেশ কয়েকজনের মনে তাঁর সম্বন্ধে নানা নালিশ জমা থাকত, মাঝে মাঝে প্রকাশও হয়ে পড়ত-।"[৪৮] "পার্টি মহলে বিষ্ণু সম্পর্কে সংশয়, 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর রচয়িতা সম্বন্ধে একটু যে সন্দেহ ছিলনা প্রথমে তা বলব না, ভারত জীবনের বিচিত্র চেহারা দেখে গভীরভাবে বিষণ্ন অথচ আপাতদৃষ্টিতে ঈষৎ পুলকিত কবি বিচ্ছিন্নতার দূরাবস্থিত শিখর থেকে

মনোরম ব্যাজোক্তি এবং তার পৌনঃপুনিকতাতেই পর্যবসিত থাকবেন, এবম্বিধ সংশয় যে জাগে নি তা নয়।"[৪৯]

বস্তুত মূল সমস্যাটি নিহিত ছিল বিষ্ণু দের ব্যক্তি-স্বভাবের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে শিল্পগত নীতির প্রশ্নে কবির চৈতন্যধৃত স্বকীয়ত্ব ও স্বাধীনতার তারতম্যের মধ্যে। শিল্পী-মানসের সার্বভৌমত্ব ও স্বতঃ নিয়ন্ত্রণ-শক্তির প্রতি বিষ্ণু দের বিশেষ মনোযোগ প্রদান, অন্যদিকে তিরিশ দশকের আধুনিক পাশ্চাত্য কবিদের ভাবাদর্শ, আঙ্গিক দ্বারা প্রভাবিত কবি-চৈতন্যের বিশেষ রূপটি ঐসব সংশয়-জিজ্ঞাসার উদ্ভব ঘটিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক-চৈতন্য প্রসঙ্গে হীরেন্দ্রনাথের ভাষ্য, "ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কার্ডধারী সদস্য তিনি কখনও ছিলেন না, আমরা তাকে সেভাবে টানার চেষ্টাও করতাম না। কিন্তু তিনি ছিলেন সর্বদা ও সর্বক্ষণ মার্কস-কথিত "The party in the grand historical sense of the term"-এর অঙ্গীভূত।"[৫০]

ক্রমশ তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা ব্যক্তিগত আক্রমণে পর্যবসিত হয় এবং বিষ্ণু দের মানসজগতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তিনি সক্রিয় রাজনীতির পথ পরিহার করেন (অবশ্য এই সক্রিয়তা হচ্ছে সভাসমিতি ও সম্মেলনে অংশগ্রহণ) এবং একটি স্বকীয় শৈল্পিক অবস্থান গ্রহণের দিকে ঝুঁকে পড়েন। প্রথম পর্যায়ে যে আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিয়েছিল, এখনকার সংকটকে সে তুলনায় বলা চলে তত্ত্বগত সংকট (ideological crisis)। এই তত্ত্বরূপ সম্পর্কে বিষ্ণু দের বিশ্লেষণ "আইডিয়োলজি বা তত্ত্ব বলতে মনোবিজ্ঞানে বোঝাচ্ছে একটা অচেতন প্রবণতা যা থাকে ধর্মীয় বা বৈজ্ঞানিক অথবা রাজনৈতিক চিন্তা ও মতবাদের ভিতে, যে প্রবণতা বিশেষ সময়ের প্রয়োজনে বাস্তবকে, তথ্যকে মেলায় ভাবের সঙ্গে এবং ভাবকে মেলায় তথ্যের সঙ্গে, যাতে সৃষ্টি করা সম্ভব হয় এমন এক বিশ্বচিত্র বা মূর্তি যার আস্তিক্যের প্রাবল্যে আইডেনটিটির যৌথ এবং ব্যক্তিক বোধ দুই-ই সমর্থনযোগ্য হতে পারে।"[৫১]

বিষ্ণু দের তত্ত্বগত সংকট তীব্ররূপ ধারণ করে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে পি. সি. যোশীর উত্থান-পতনের অভিঘাত দিয়ে। রাজনীতি ও শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে চরমপন্থা অবলম্বনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবস্থাটিকে আরও ধূম্রজালে জড়িয়ে ফেলে। ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে কমিউনিস্ট নন্দন-তত্ত্বের ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল রাশিয়ায়, ফ্রান্সে। রাশিয়ায় ১৯১৭

সালের পর লেনিনের সময়কালে সংস্কৃতিচর্চার যে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন ছিল তা ১৯৩২ সালের পর থেকে বিশেষভাবে স্তালিনের (১৮৭৯–১৯৫৩) সময়কালে সংকটাপন্ন অবস্থায় নিপতিত হয়। লেনিন বিপ্লব–পরবর্তী রাশিয়ায় সাহিত্য–সম্পর্কিত বিতর্কে হস্তক্ষেপ করেন নি, কোনরকম ব্যবস্থাপত্রও দেন নি। বরং তাঁর 'টলস্টয়'–বিষয়ক প্রবন্ধে সৃষ্টিশীল সাহিত্য রচনার প্রতি স্বীকৃতিই প্রকাশ পেয়েছে।

মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন নীতি–নির্ধারণের অভাবই ছিল এসব তর্কবিতর্কের ও জটিলতার কারণ। মার্কস, এঙ্গেলস বা লেনিন শিল্প–সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কে সুসংবদ্ধ, পৃথক ও ধারাবাহিক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নি। তবে এঁরা বিভিন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে শিল্পসাহিত্য তথা উপরিকাঠামো সম্পর্কে যেসব আলোচনা ও মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তার পরিমাণ বিপুল না হলেও পর্যাপ্ত ও অর্থময়। কিন্তু এসব পর্যালোচনা–ধ্যানধারণাকে সূত্র বিবেচনা করে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ধ্যানধারণা বিকাশের প্রশ্নে নানা ব্যক্তির নানা মত ও বৈপরীত্য দেখা দিয়েছিল।

রাশিয়াতেই স্তালিনের সময়কালে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ' নামক ধারণার উদ্ভব ঘটে, যার প্রবক্তা ছিলেন আঁদ্রে ঝদানভ (১৮৯৬–১৯৪৮)। স্তালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদই ছিল রাশিয়ার সাহিত্য ও শিল্পকলার একমাত্র নিয়ন্ত্রণী শক্তি ও নির্ধারিত নীতি। নীতিটির সূত্রমালা হচ্ছে, সাহিত্যকে আশাবাদে সমৃদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক গুণাবলী বিশিষ্ট নায়কের স্রষ্টা, জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ ও সরলরৈখিক রচনারীতির অধিকারী হতে হবে।[৫২] স্তালিনের আমলে এই নীতির কঠোর প্রয়োগের ফলে রুশ সাহিত্য বর্ণহীন, মৌলিকতা–বঞ্চিত রূপে গড়ে উঠতে থাকে। এর বিরোধিতা করায় রাশিয়ায় অনেক কবি–সাহিত্যিক নির্যাতিত হন। লেখক জশচেঙ্কো ও কবি আখমাতোভাকে তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে রাশিয়ার সমাজজীবনকে বিকৃত ভাবে পরিবেশনের দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং সোভিয়েত লেখক সংঘ থেকে বিতাড়িত করা হয়। সৃষ্টিশীল রচনার ক্ষেত্রে এ সময়টা রাশিয়ার জন্য ছিল বন্ধ্যাকাল।

অন্যদিকে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য রজের গারোদি এবং পিয়ের এরভের চিন্তাধারায় আর্টের ক্ষেত্রে পার্টি–লাইন বা কমিউনিস্ট নন্দনতত্ত্ব অস্বীকৃত হল। রাশিয়ার ঝদানভ এবং ফ্রান্সের রজের গারোদি ও

আরাগঁর মার্কসীয় নন্দনতাত্ত্বিক মতামত ও বিতর্ক বাংলাদেশের মার্কসীয় মতাবলম্বীদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। এদেশীয় লেখক বুদ্ধিজীবীরাও—যাঁরা প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁরা উক্ত বিষয়ে বৈঠকে মিলিত হতে থাকেন ১৯৪৭ সালের শেষ দিকে। ১৪ই ফেব্রুয়ারী 'অরণি' পত্রিকার 'সমসাময়িক সাহিত্য' সংখ্যায় গারোদি, এরভে এবং লুই আরাগঁর আর্টের সমস্যা সম্পর্কিত বক্তব্য ছাপা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় বিষ্ণু দে মূল ফরাসী থেকে ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টির তাত্ত্বিক নেতা, শিল্পসমালোচক ও লেখক রজের গারোদির প্রবন্ধের (Artist Without Trousers) অনুবাদ করেন 'উর্দিহীন শিল্পী' নামে। এই প্রবন্ধের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত ভারতীয় সাম্যবাদী মহলে শিল্পসংস্কৃতির আলোচনায় ব্যাপক বির্তকের সূত্রপাত ঘটে। প্রগতি লেখক সংঘ আয়োজিত বিভিন্ন বৈঠকে বাংলার মার্কসবাদী লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে মতবিনিময়ে, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে থাকেন। গারোদি এবং এরভের মত ছিল, কমিউনিষ্ট নন্দনতত্ত্ব বলে কিছু নেই এবং শিল্পীর পক্ষে কোন পার্টি লাইন মেনে চলা সঙ্গত নয়। বিপক্ষে লুই আরাগঁর মতানুযায়ী সাহিত্য-শিল্পকলা হবে পার্টি লাইন-নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুত চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকব্যাপী সমাজ-অর্থনীতির শ্রেণী বিশ্লেষণের দ্বারা সাহিত্যের মার্কসবাদী বিচার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। আরাগঁ-গারোদি বিতর্কের মূলেও ছিল শিল্পের শ্রেণীচরিত্র ও শিল্পীর শ্রেণী-ভূমিকার নির্ধারণ-বিষয়ক সীমাবদ্ধতা। মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলগুলোর সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে বিদ্যমান থেকেছে শিল্পী-সাহিত্যিক সম্পর্কে বিশেষ ধারণা, যা সেই দলগুলোর বিশেষ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বা তাত্ত্বিকতা থেকেই উদ্ভূত হয়েছিল। আরাগঁ-গারোদি বিতর্ক নিয়ে যে সব বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে থাকে, সেখানে প্রচুর তর্কবিতর্ক ও আলোচনার মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দের পক্ষই সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জয়লাভ করে। তাঁর উপস্থাপিত "উর্দিহীন শিল্পী"-র বক্তব্য তথা গারোদির মত সমর্থন করেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিপক্ষে আরাগঁর মত সমর্থিত হয় নীরেন্দ্রনাথ রায়, রাধারমণ মিত্র, গোপাল হালদার, সরোজ দত্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীর দ্বারা। এই দল বিভক্তির ফলস্বরূপ মার্কসবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং তাঁদের সহযাত্রীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব প্রকটরূপ ধারণ করে। যেহেতু বিষ্ণু দে-ই

গারোদির মতামত উপস্থাপন করেছিলেন, সেহেতু তিনি পার্টিতাত্ত্বিকদের বিরাগভাজন হন। 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় (১৩৫৪ বঙ্গাব্দ) সংখ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের— বিশেষত অচিন্ত্যকুমারের কথাসাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে "গল্পে উপন্যাসে সাবালক বাংলা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় 'পরিচয়' পত্রিকায় নীহার দাশগুপ্ত "শারদীয় সাহিত্যে ছোটগল্প" প্রবন্ধে বিষ্ণু দের বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। 'পরিচয়' ১৩৫৪ পৌষ সংখ্যায় হিরণকুমার সান্যাল তারাশঙ্করের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' আলোচনায় বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করেন। ঐ একই সংখ্যায় প্রকাশিত হয় "পাঠকগোষ্ঠি" কলামে "শারদীয় সাহিত্যে ছোটগল্প" শীর্ষক বিষ্ণু দের চিঠি; চিঠিতে তিনি বেশ রূঢ়ভাবেই প্রতিবাদ জানান কমিউনিস্টদের দলগত মনোভাবের বিরুদ্ধে। মাঘ সংখ্যায় নীহার দাশগুপ্ত ও অনিল সিংহ এর প্রত্যুত্তর দেন।

শারদীয় সাহিত্যে প্রকাশিত ছোটগল্প সম্পর্কে বিষ্ণু দের মতামতকে কেন্দ্র করে ঐসব বিতর্কের ভিত্তিতে বিষ্ণু দে ক্রমান্বয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণের সম্মুখীন হতে থাকেন। এরকম একটি আক্রমণের ভাষা, "বুদ্ধিবিলাসীর আত্মাভিমানে যখন আঘাত লাগে, তখন তাঁর তথাকথিত ভদ্রতার মুখোশ খুলে পড়ে, প্রতিপক্ষের গায়ে কাদা ছিটানো ছাড়া তাঁর আর কোনো গত্যান্তর থাকে না।"[৫৩] বস্তুত 'পরিচয়' পত্রিকাতেই এসব তর্কবিতর্কের ও আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৪, ফাল্গুন সংখ্যায় 'পরিচয়ে' বিষ্ণু দের অমার্কসীয় সাহিত্যদৃষ্টি উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হন। তাঁর ভাষ্য, "বিষ্ণু বাবুর মার্কসিস্ট জ্ঞান যে কতদূর অপরিচ্ছন্ন তার আরেক প্রমাণ লেখা থেকে লেখককে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার যুক্তির মধ্যে পাই। — প্রকৃত পক্ষে বিষ্ণু বাবু এখানে 'আর্টের জন্যই আর্ট'-এর পক্ষেই একটু ঘুরিয়ে ওকালতি করেছেন।"[৫৪]

এসব আলোচনার প্রতিক্রিয়া বিষ্ণু দের মানসজগতে প্রবল বিপর্যয় ঘটায়। তাঁকে প্রতিতুলিত করা হয় লোককবি গুরুদাস পালের কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে। প্রদ্যোৎ গুহ গুরুদাস পালের 'কলকাতার খবর'-এর মুক্ত প্রশংসা করেন।[৫৫] এসব আলোচনা প্রসঙ্গে ধনঞ্জয় দাশের বিশ্লেষণ হচ্ছে, "বিষ্ণু দে রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন অন্যতম প্রধান কবি; প্রগতিসাহিত্য

আন্দোলন ও 'পরিচয়'–পরিচালকমণ্ডলীরও তিনি দীর্ঘদিনের সুখ–দুঃখের সাথী। যে পত্রিকার তিনি অন্যতম পরিচালক সেই পত্রিকাতেই তাঁর এতদিনের লালিত সাহিত্য–বিষয়ক ধ্যান–ধারণা ও বিশ্বাস শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য–লেখকই নন, হিরণকুমার সান্যাল–এর মতো উদার–হৃদয় প্রবীণ সমালোচকও যেভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিলেন তাতে তাঁর মনের প্রতিক্রিয়া কত ভয়ঙ্কর রূপ পরিগ্রহ করতে পারে, কালের ব্যবধানে দাঁড়িয়েও তা বুঝতে আমাদের এতটুকু অসুবিধা হয় না।"[৫৬] বিষ্ণু দে বিপর্যস্ত মন নিয়ে 'অবজ্ঞামূলক মনোভাব ও উগ্র মতবাদের উদ্ধত যান্ত্রিকতায় সাহিত্যে প্রগতির ও প্রগতি সাহিত্যেরও সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা'র[৫৭] কথা বলে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে ফাল্গুন ১৩৫৪ সংখ্যা থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যপদ থেকে দারুণ ক্ষোভে পদত্যাগ করেন। এরপর থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ তিনি 'পরিচয়ে' লেখা প্রকাশ করেন নি।

এই ঘটনার কিছু দিন পর ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে বিষ্ণু দে এবং চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করেন 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকা। এ পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বিষ্ণু দে স্বীয় নন্দনতাত্ত্বিক মতাদর্শ প্রকাশের একটি ক্ষেত্র গড়ে তোলেন। তবে 'সাহিত্যপত্র' শুধু যে 'পরিচয়ের' বিপক্ষ হিসেবে অকস্মাৎ বের হল তা নয়। এর পেছনে বিষ্ণু দের দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা ছিল, "সেই সময়ে যে সব মার্কসবাদী পত্রিকা ঠিক সাহিত্য মানদণ্ডে উৎকর্ষ বাড়াতে পারছিল না, সেই কারণে বিষ্ণু দে কেবলমাত্র সাহিত্য–বিষয়ক একটা কাগজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন।"[৫৮] 'পরিচয়'–এর রাজনৈতিক পত্রিকার পাশে সাহিত্য–বিষয়ক পত্রিকারূপেই এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

বামপন্থী উগ্র মতবাদ ও মার্কসবাদী তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ় মনোভাব উন্মোচিত হতে থাকে পত্রিকাটির বিভিন্ন আলোচনা–সমালোচনামূলক রচনায়। এই পত্রিকার সমর্থক ছিল 'ক্রান্তি' পত্রিকা।[৫৯] 'সাহিত্যপত্রের' প্রথম সংখ্যাতেই পুস্তক সমালোচনারূপে বুদ্ধদেব বসুর *An Acre of Green Grass* (১৯৪৮)–এর আলোচনাকালে[৬০] বিষ্ণু দে একই সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর নন্দন–সর্বস্বতার যেমন সমালোচনা করেন, তেমনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। এর ফলে মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ জাগে এবং বিষ্ণু দে আরও বেশি সমালোচিত হতে থাকেন। তৎকালীন বামপন্থী লেখক ভবানী

সেন "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা"[৬১] এবং প্রদ্যোৎ গুহ "সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি"[৬২] শীর্ষক প্রবন্ধে বিষ্ণু দে-কে আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু করে সমালোচনার ধারাকে তীব্রতর করে তোলেন; তাঁরা বিষ্ণু দে-কে 'তৃতীয় শিবির' বলে অভিহিত করেন। বিষ্ণু দের মার্কসবাদ সম্পর্কিত বিশ্বাসকে ভ্রান্ত বলে অভিযুক্ত করেন।

ভবানী সেনের বক্তব্য, "প্রথমত তাঁর কলাকৌশল বক্তব্য বিষয়কে সহজ ও সরল করে না, যতদূর সম্ভব দুর্বোধ্য ও জটিল করে তোলে। তাঁর কবিতাকে দণ্ডীর ভঙ্গীকাব্যের মত ব্যাকরণ বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত তাঁর কলাকৌশল মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করে না বরং বাইরের বস্তু ও ভাবগুলিকে একটা অতীন্দ্রিয় রূপ দিয়ে ভিতরে টেনে নেয়, যা সহজে বুঝি তাকেও 'বুঝিনা'র পর্যায়ে ফেলে দেয়। তৃতীয়ত তাঁর কলাকৌশল ভাবের ঐক্য এবং শৃঙ্খলাকে ভেঙে মনোরাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি করে। — এই কলাকৌশল বস্তুনিষ্ঠ নহে, ব্যক্তি-নিষ্ঠ, গণতান্ত্রিক নহে, আত্মকেন্দ্রিক, গঠনমূলক নহে, অরাজক। এ কলাকৌশল হল বুর্জোয়া ভাবধারার দৈন্য ও অরাজকতা থেকে উৎপন্ন। এর সঙ্গে মার্কসবাদের কোন সম্পর্ক নেই। বিষ্ণু বাবু একজন দক্ষ কলাকৌশলবিদ, কিন্তু মার্কসিস্ট নন। তাঁর কলাকৌশল মার্কসবাদকেই হত্যা করে।" ৬৩

প্রদ্যোৎ গুহের মন্তব্য, "আজকের সামাজিক সত্য হল এই যে, বুর্জোয়া ব্যবস্থার অন্তিমকাল উপস্থিত। বিপ্লবের শক্তি সংহত, আর আগামীকালের প্রাণস্পন্দন হল বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষ! (না, অবান্তর আশার দ্বারা উত্তেজিত করা নয়— এই সত্য) বুর্জোয়া সাহিত্যিকের পক্ষে এই সত্যকে রূপ দেওয়ার অর্থ নিজেদের মৃত্যুদণ্ডে স্বাক্ষর করা। সেই জন্যই তাঁরা আজকের সামাজিক সত্যকে গোপন করার চেষ্টা করেন। তাঁদের ফর্ম তাই সত্যগোপনের ফর্ম। এই ফর্মের চটকদার নামাবলী পরে তারা নিজেদের দেউলিয়াপনা ঢাকবার চেষ্টা করেন, একথা বিষ্ণু বাবুর সম্পর্কেও সত্য।"[৬৪] বস্তুত এখানে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯৪৮) গৃহীত ও অনুসৃত রণনীতি ও রণকৌশলকে হঠকারী ভাবে প্রয়োগ করেছেন প্রদ্যোৎ গুহ। যদিও পরবর্তীকালে তাঁরা উভয়ে মত বদলে ছিলেন। "অনেক পরে কমিউনিস্ট পার্টি যখন তার ভ্রান্তি মোচন করল, রণদীভের পতন ঘটল, তখন অবশ্য ভবানী সেন — বিষ্ণু দের কাছে এসে মার্জনা চান। এবং ধন্যবাদ জানিয়ে স্বীকার করেন যে, সাহিত্যপত্র

ত্রৈমাসিক, বিষ্ণু দে-র প্রায় একক মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের সূত্রগুলির জন্যে আপ্রাণ লড়াই করে রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র প্রভৃতি সবার রচনার যোগ্য মর্যাদা দেওয়ার এই চেষ্টা শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে হতাশ ও ক্রুদ্ধ করলেও, একেবারে মার্কসবাদবিরোধী করে তোলেনি। ভবানী বাবু অনুরোধ করেছিলেন বিষু দে যেন অতঃপর বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনের হাল ধরেন।" ৬৫

এই মতান্ধতার প্রেক্ষাপট হচ্ছে ১৯৫০-এর জানুয়ারীর দিকে বি. টি. রণদীভে কর্তৃক পরিচালিত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অনুসৃত অতিবামপন্থা। এই উগ্রনীতির ফলে পার্টির অভ্যন্তরে রাজনৈতিক সংকট চূড়ান্তরূপ নিয়েছিল। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতৃত্ব এ সূত্রে সঠিক পথ দেখানোর উদ্দেশ্যে কমিনকর্ন-এর মুখপাত্রে (Information Baurou of the Communist and Workers Parties) সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশ করে। আন্তঃপার্টি সংঘাতের জের প্রগতি সংস্কৃতি শিবিরে দ্বিধাবিভক্তি ঘটিয়েছিল। এই সংঘাত চলে মে-জুন ১৯৫০ পর্যন্ত। মে-জুনের এক অধিবেশনে এর মীমাংসায় তৎপর হন নির্বাচিত কমিটির সদস্যবৃন্দ। এই অধিবেশনেই রণদীভে বাদ পড়েন নতুন কমিটি থেকে এবং কার্যভার গ্রহণ করেন রাজেশ্বর রাও। এতে চৈনিক বিপ্লবের পন্থা অনুসরণের নীতি গৃহীত হয়।

'সাহিত্যপত্র' পত্রিকার ঘোষিত সম্পাদক না হলেও বিষ্ণু দের নান্দনিক অবস্থান এ পত্রিকাতেই চিহ্নিত হচ্ছিল এবং পার্টির বাইরে স্বাধীনভাবে নিজস্ব কবিতা রচনার পালা অব্যাহত রূপে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ অর্থেই 'সাহিত্যপত্র' বিষ্ণু দের নান্দনিক অস্তিত্বের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। যদিও 'পরিচয়'-এর মতো উচ্চমানে পত্রিকাটি উত্তীর্ণ হতে পারেনি। মার্কসবাদী হয়েও তিনি মার্কসীয় দর্শন ও নন্দনতত্ত্বের মধ্যকার সীমারেখাটি সম্পর্কে সচেতন থেকেই নিজস্ব অবস্থানকে যাথার্থ্য দিতে চেয়েছিলেন। যেহেতু বিপ্লবের মননই তাঁর আরাধ্য— বিপ্লব নয়, আবার পরোক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উপরই দণ্ডায়মান অথচ প্রত্যক্ষভাবে কোন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বোধে আশ্বস্থ নন, সেহেতু বিষ্ণু দে প্রায় একক এক ব্যক্তিত্বে পর্যবসিত হন তৎকালীন মার্কসীয় আদর্শবাদী গোষ্ঠী থেকে।

বস্তুত, মার্কসবাদী ইতিহাসবোধ বা সমাজবোধের মধ্যে, সমাজসম্পর্ক বা ব্যক্তি-সম্পর্কের মধ্যে একটা নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তা নিহিত আছে, যে-

নির্দিষ্টতা ও নিশ্চয়তার চেতনা মানুষকে সমাজ পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এখানে সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে সে যে-অর্থে 'সক্রিয় মানুষ', সে-অর্থে সক্রিয়তা নেই শিল্পসাহিত্যে। শিল্পসাহিত্যের সৌন্দর্য-চেতনায় অনেকটাই অনিশ্চয়তা বা অনির্দিষ্টতার ঘেরাটোপ থাকে, থাকে টেকনিকের জটিলতা, যাকে ভাববাদ বলে তুচ্ছ করা যায় না। জীবনের প্রত্যক্ষতার লড়াইয়ের সক্রিয়তার পাশে শিল্পসাহিত্যের মনের সক্রিয়তা পৃথক জিনিস। প্রকৃত মার্কসবাদ শিল্পীর স্বকীয় সৃজনসত্তার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে না, তবে আবার এই স্বাধীনতা নির্বিশেষও নয়। মার্কসীয় চিন্তায় এই স্বাধীনতা হচ্ছে শিল্পীর যুগের ও সমাজের বাস্তব ঐতিহাসিক প্রয়োজনের সঙ্গে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রকৃত সমাজসচেতন শিল্পীই যথার্থ স্বাধীন শিল্পী, যিনি ইতিহাস ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সূত্রে সৃজনকর্মকে গড়ে তোলেন।[৬৬] এ জন্য চাই ভিন্নতর অনুশীলন ও চর্চা, মানসের উদ্বোধন। বিষ্ণু দে সাংগঠনিকভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণের চেয়ে মনের সক্রিয়তার অনুশীলন ও সচেতনতার উপর বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর নন্দন-চিন্তায় এই সচেতনতার সঙ্গে বিমিশ্র হয়েছে ব্যক্তি-রচয়িতার স্বাধিকার, বিষয়ের সঙ্গে কর্মের সমগুরুত্ব ও ব্যক্তিগত শিল্পরুচির প্রসঙ্গ। তিনি মার্কসীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি এই সময়কার বামপন্থী মহলের আতিশয্যে বীতশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করেছেন। এবং নিজের পত্রিকা ঐ 'সাহিত্যপত্রে' নানা বক্তব্য প্রকাশের ভিত্তিতে মতান্ধতাকে চিহ্নিত করেছেন। এসব বক্তব্যের কিছু দৃষ্টান্ত—

১. "এতদিন মুখ্যত এক একপেশে শিক্ষার প্রভাবে ইংরেজি-শিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত ইংরেজি শাসন-ব্যবস্থার সৃষ্টি মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতির অপরিসর চলনবিলেই মার্কসবাদের সংস্কৃতি চিন্তা মোটামুটি ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অথচ বোঝা যাচ্ছিল জলাশয় আরও আছে, স্রোতগ জলধারাও। কারণ ওই সংস্কৃতি যে শুধু মুষ্টিমেয় তা নয়, মাত্র উনিশ শতকের যে তা নয়, তার চেয়ে বড়ো কথা, ওই শিক্ষা-সংস্কৃতির যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপরে ভিৎ সে শ্রেণী বিদেশী শাসকের ব্যবসায়ীর ক্রীড়নক মাত্র, শাসকও নয়, উৎপাদক ব্যবসায়ীও নয়। বুর্জোয়া সমাজের উদারনীতির অসম্পূর্ণ সভ্যতাও তাইতো আমরা পাইনি। পশ্চিম য়ুরোপের রেনেসান্স বা আধুনিকতার বিকাশ আমরা বাঁকা আয়নায় পেয়েছি বেঁকেচুরে। — ডায়ালেকটিকস ও তাৎকাল্য ভুলে পোত্রুভস্কির মতো আমাদেরও ইতিহাস সন্ধানে বর্তমানের চোখে অতীতকে দেখতে গিয়ে ইতিহাস বিকৃত করার সম্ভাবনা বর্তমান, যার বিরুদ্ধে রাশিয়ার

স্টালিন, ঝদানভ ও কিরভ্‌কে লড়তে হয়েছিল। মুস্কিলটা আরও বেশি হয়ে পড়ে যখন এই একপেশে মার্কসবাদের প্রয়োগ হয় সাহিত্যবিচারে।"[৬৭]

২. "প্রথমত সামাজিক রাজনৈতিক পটবিচার না করে সাহিত্যের ব্যাপক বিচার অসম্পূর্ণ, আবার যদি পটবিচারের মূল্য নিরূপণের সঙ্গে সাহিত্যিকমূল্য-নিরূপণ না মেলে তাহলে তা মেলাতে হয়। সংক্ষেপে নয়, পূর্ণজিজ্ঞাসায়, শিল্প–সাহিত্যের বিশিষ্ট ইতিহাসের পটে মিলিয়ে এবং সাহিত্য–শিল্পের প্রক্রিয়াগত রূপান্তরগত নিজস্ব সার্থকতা বা মানবিচারের মর্যাদা রেখে। অনেক সময়ে হয়তো ঐ শেষোক্ত অর্থাৎ সাহিত্যিক বিচারণা থেকেই সমাজ– রাজনীতিগত পুনর্বিচারের সূত্রপাত। কিন্তু মুখ্যত সমাজ–রাজনীতির দিক থেকে বিচারে এ সংক্ষেপের বিপদও সম্ভব, যেমন অন্যপক্ষে সম্ভব সাহিত্যিক স্বত্বরক্ষার গণ্ডিতে ঘুরে ঘুরে বিকাশের পথরোধ করা।"[৬৮]

৩. "তাছাড়া শিল্পকর্ম যে এখনও কিছুটা আদিম সে কথা ভুললে চলে কি করে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিল্পগুলি এবং বিশেষ করে আমাদের সমাজজীবনে। সিনেমা, বালে, নাট্যমঞ্চ ও পোস্টার ছাড়া যৌথ শিল্প কৈ আর? অধিকাংশ আদিম শিল্প যথা সাহিত্য বা স্টুডিওচিত্র আজও ব্যক্তির হাতে গড়া, and therefore of necessity, small, dwarfish, circumscribed. But for this very reason, they belonged as a rule to the producer himself. তাই এখনো শিল্পকে, এই ইন্দ্রিয়–গত মানবিক কর্ম–প্রক্রিয়াকে শুধুই যৌথ সামাজিক পণ্যদ্রব্য ভাবাটা মার্কসবাদের পরিপন্থী।"[৬৯]

মার্কসবাদীদের সাহিত্যিক নিষ্ঠা ও সমালোচনার প্রকৃত পথ তখনও স্থিরীকৃত হয়নি বলেই বিষ্ণু দে বিরোধীপক্ষের তর্কবিতর্কের উক্ত মূল্যায়ন করেন। চল্লিশের দশকে এদেশের বামপন্থী দলগুলি অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও সঠিক মূল্যায়নে সক্ষম হয় নি। অতিমূল্যায়নের কারণে তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে বিপ্লব সমাসন্ন এবং এ ভাবনার উত্তেজনায় সাহিত্য–সংস্কৃতিভাবনাও ছিল গ্রস্ত। তাঁদের এই ভ্রান্ত অর্থনৈতিক বিচারের প্রভাব পড়েছিল তদানীন্তন যান্ত্রিক উগ্র সাহিত্যবিচারের মধ্যে; যার ফলে বিষ্ণু দে 'পেটি বুর্জোয়া', 'তৃতীয় শিবির' ইত্যাদি অভিধায় বিভূষিত হন। তদুপরি ঐ সময় বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যবিচার ও রবীন্দ্র–ভাবাদর্শের একপেশে যান্ত্রিক বিশ্লেষণ বিষয়টাকে

আরও অস্বচ্ছ করে দিয়েছিল। ঐতিহ্যসন্ধানের সূত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অতিমূল্যায়ন (সিপাহী বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, সন্ন্যাসী–ফকির বিদ্রোহ ইত্যাদি) ও ভুল বিচার এবং রবীন্দ্রনাথকে প্রতিক্রিয়াশীল রূপে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস এই সময়ে বেশ প্রবল ছিল। তবুও এই উত্তপ্ত পরিবেশে মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের যে প্রবৃদ্ধি ও লালন–পালন ঘটেছে, তার বহুমুখী তাৎপর্য বিষ্ণু দের কবিমানসকে বিশিষ্টতা দিয়েছে, তাঁর কবি–সত্তাকে স্বকীয় অবস্থানে ও বিকাশে একাগ্র করেছে এবং কাব্য–সাধনার সৃষ্টিশীল গতিপথকে স্বতঃপ্রবহমান রেখেছে। তৎকালীন এই মার্কসীয় চিন্তাচৈতন্যের আলোড়ন–বিলোড়ন ও জটিলতা থেকে সময়ের দূরত্বে দাঁড়িয়ে অনেকেরই দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছিল। এরকম দুটি মূল্যায়ন হচ্ছে ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য–বিতর্ক' গ্রন্থের ভূমিকাংশ এবং অরবিন্দ পোদ্দারের বিশ্লেষণ। ধনঞ্জয় দাশ ভবানী সেন রচিত "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা" (১৩৫৬) এবং প্রদ্যোৎ গুহের "সাহিত্যবিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি" প্রবন্ধদ্বয়ে যে উগ্রতা ও মতান্ধতা, তার মূল্যায়ন করে চৈত্র ১৩৮২ বঙ্গাব্দে লেখেন "এ দুটি প্রবন্ধে ভ্রান্তি ও উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছিল সত্যি–। এই মানসিকতা পরিপুষ্ট হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন রণনীতি ও রণকৌশলের লিখিত–অলিখিত নির্দেশক্রমেই। – পুরোনো ভুলের প্রচন্ড ক্ষয়–ক্ষতিকে বিন্দুমাত্র লঘু না করে ধীর–স্থিরভাবে চিন্তা করলে, বিনীতভাবে স্বীকার করতে পারি, টিটোবাদী–ট্রটস্কিবাদী বুলি ছিল আমাদের অপরিণত রাজনৈতিক চেতনার সাময়িক আশ্রয়ভূমি মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং গ্রহণ–ক্ষমতার তারতম্য থাকা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কেউ–ই সেদিন অভ্রান্ত ছিলেন না, সকলের দৃষ্টিই ছিল কম–বেশি অস্বচ্ছ এবং কুয়াশাচ্ছন্ন।"[৭০]

অরবিন্দ পোদ্দারের সাম্প্রতিক মূল্যায়ন, "আমরা যারা সমাজবিপ্লবে বিশ্বাসী এবং সেজন্য সংগ্রাম ও আত্মত্যাগে প্রস্তুত, তারা সাহিত্যের পৃষ্ঠায়ও আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ, কর্মসূচী ও সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি দেখায় আগ্রহী। আদর্শগত বিশ্বাসের সেই একাগ্রতা, সেই বিরামহীন কর্মচাঞ্চল্য, নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম, সেই কল–কোলাহল ও অস্থিরতা কাব্য–নাটক–উপন্যাসের পাতাগুলোকে উর্মিমুখর করে তুলুক রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষার এই অতিশয় ভাবনায় আমরা উদ্বেল হয়ে উঠি। বিশ্রাম গ্রহণের কোন অবকাশ নেই, এই মুহূর্তেই এক উপপ্লাবী কর্মের মাধ্যমে সমাজকে রূপান্তরের পথ ধরিয়ে দিতে হবে—এই অস্থির আবেগ রূপসৃষ্টি ও রসসৃষ্টির মাধ্যমে মানুষকে উত্তাল করে

তুলুক, এই ব্যাকুলতাও রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রত্যাশা করা স্বাভাবিক। – ঠিক একই কারণে সম্ভবত বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় লেনিনের মৃত্যুর কয়েক বছর পর কিছু সংখ্যক সাহিত্যিকদের মধ্যে the seizure of power of literature বা Five year plan in poetry ইত্যাদি ধরনের হাস্যকর শ্লোগান উত্থিত হয়েছিল। সেই একই প্রয়োজনে সম্ভবত দেশে দেশে মার্কসবাদীদের মধ্যে পার্টি–নিয়ন্ত্রিত সাহিত্যের দাবী ধ্বনিত হয়েছিল। যার শোচনীয় পরিণাম আমরা রাশিয়ায় বিশের দশকের শেষের দিকে এবং ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক মতবাদের পার্থক্যের দরুণ অন্য মতাবলম্বী সাহিত্যিকদের 'পাতিবুর্জোয়া', 'প্রতিক্রিয়াশীল', সাম্রাজ্যবাদের দালাল, 'মিনারবাসী' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করে আনন্দ বোধ করতাম, তার মূলউৎসও একই। এখানেও বলা বাহুল্য বিনা দ্বিধায় প্রশ্নহীন চিত্তে এবং সম্পূর্ণ যান্ত্রিকভাবে ঐ either / or যুক্তিধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল।"[৭১]

উপরন্তু এই শতাব্দীর বিশ–তিরিশ দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংকট সম্পূর্ণরূপে অবক্ষয়ী হয়ে উঠবার পূর্বাভাসে যে কবির যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল, তাঁর পক্ষে লোকায়ত জীবনের অনুসন্ধানে, বিপ্লবের স্ফূর্তিতে বা কাব্যিক সরলীকরণে গণকবি হয়ে উঠবার পথে ইতিহাস, সমাজসংস্কার, ব্যক্তি–স্বাতন্ত্র্য–আভিজাত্যের বহুবাধাই প্রতিবন্ধকতা রচনা করে। এই প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রমের সহজ উপায় বিষ্ণু দে কেন সন্ধান করেন নি, সে প্রশ্ন তাঁর কবিসত্তার পক্ষে অবান্তর। বিষ্ণু দে যা করতে চেয়েছেন, তা হল সহজকে খুঁজবার অক্লান্ত মেধাবী সাধনা এবং তা করেছেন কঠিনকে না এড়িয়ে। এ–সূত্রেই আবু সয়ীদ আইয়ুব বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, "Bishnu De who loves to be a Marxist though it is doubtful if he is or ever will be a full blooded one. Bishnu De is far too sophisticated—bourgeasis to the roots of his being— to be a poet of the proletariet. But that is his sadhna."[৭২] "এই সাধনায় যথার্থই বিষ্ণু দে অবিচল। উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা এবং পরবর্তী সকল সংকটের মধ্য আশাবাদের প্রবল শিখা জ্বালিয়ে চলেছেন তিনি— লোরকার সেই কমরেডের মত কিম্বা নিজেরই 'শেষ রোমান্টিকের' অপূর্ণ প্রত্যাশার অভিযাত্রায়।"[৭৩] দ্বন্দ্বময় জীবন, ইতিহাস ও সভ্যতার জটিলতর অভিজ্ঞতায় নিমগ্নচিত্ত কবির সেই অভিযাত্রা নিয়েই রচিত হয়েছে

কবিতাবলী। পাঁচ দশকব্যাপী বিষ্ণু দে তাঁর স্বকালের পরিপ্রেক্ষিত ও অভিজ্ঞতাকে কাব্যগত করতে চেয়েছেন; তাতে রয়েছে একদিকে উজ্জ্বল আশাবাদ, প্রত্যয় ও মানবীয়তা, অন্যদিকে দ্বিধা-সংশয়, ভ্রান্তির উপমা-উপমানে আচ্ছন্নতা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াসহ সমকালের দেশীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি, মানুষ, কাব্যাদর্শ—সবকিছুর এক বিশাল জগৎ তাঁর কবিতায় স্বকীয় টেকনিকের গ্রন্থনায় প্রবিষ্ট হয়েছে।

খণ্ডবিখণ্ড মানুষ তার নান্দনিক বৃত্তির প্রতিবন্ধকতাগুলোকে সংশয়হীনতা বা সরল আত্মতৃপ্তির হাত থেকে উদ্ধার করে 'অজস্র বিরোধের সমবায়ে তৈরী এক পূর্ণতার বোধে' 'সিনথেসিস' রূপে পেতে চেয়েছেন। এই পূর্ণতা শুধুই বিরোধহীন আস্তিক্যের পূর্ণতা নয়, এটা বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্ববিদ্ধ এবং অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতায় সংলগ্ন। মানুষের জয়পরাজয়, উপলব্ধি ও বেদনাবোধ এবং চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশের এক অন্তহীন প্রগতি দ্বান্দ্বিক ন্যায়ের অন্তর্গত হয়ে তাঁর কবিতায় বিধৃত হয়েছে। এখানে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ভিত্তি হলেও শিল্পের সত্যই সার্বভৌম; তাঁর কাব্যভাবনা মননশীলতায়, বিজ্ঞানশুদ্ধ চিন্তায় সংস্থিত হলেও শিল্পের স্বায়ত্তশাসিত রূপটিই অনন্য ও চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য,"বস্তুতঃ মার্ক্সের রচনাবলীতেই বিষ্ণু দে তাঁর ঈপ্সিত বিশ্বদর্শনকে, অন্যভাষায় তাঁর তত্ত্ববিশ্বকে, নন্দনতত্ত্বের ভিত্তিকে খুঁজে পান, বলা ভাল নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জন করেন। কিন্তু এই বিশ্বদর্শনকে বিষ্ণু দে যেভাবে আত্মস্থ করেন বা তাঁর নন্দনচিন্তার, নান্দনিক লক্ষ্যের ভিত্তি করেন; তা তাঁর নিজস্ব। এই দর্শন থেকেই তাঁর নন্দনতাত্ত্বিক মেথডোলজি গড়ে ওঠে বা তাঁর কাব্যজগতের কাঠামো নির্মিত হয়, কিন্তু তার সঙ্গে মার্কসবাদের নামে প্রচলিত শিল্প-সাহিত্যচিন্তার পার্থক্য প্রায় মৌলিক"।[৭৪]

যেহেতু বিষ্ণু দের উক্ত মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব গড়ে উঠেছে একদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের চাপে, শিল্পসর্বস্বতা ও মার্কসীয় তত্ত্বের যান্ত্রিক প্রয়োগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, আবার যেহেতু তাতে যুক্ত ছিল তাঁর কবিতারচনারও দ্বন্দ্বময় কঠিন অভিজ্ঞতার অন্তর্চাপ, সে-কারণে এরই মধ্যে আবার ব্যক্তিক প্রতিক্রিয়া ও বিশ্বদর্শনের একটি বিমিশ্র রূপমূর্তিও লক্ষণীয়। নিম্নোক্ত ক্রমিকতায় বিষয়টিকে সূত্রবদ্ধ করা যায়—

১. তাঁর এই নন্দনতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে, মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্যের নৈর্ব্যক্তিক পরিগ্রহণ, সমকালের সংকট ও সংঘাত—দৃশ্য অঙ্কন এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় প্রত্যয় ও অনন্ত সম্ভাবনায় উত্তরণশীলতা।

২. শিল্পরচনা শ্রমেরই উচ্চতর রূপ, যার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিবিশেষের আত্মপ্রকাশ সৃষ্টিময় সত্তার সাযুজ্য লাভ করে এবং মানসজীবনের স্বতঃনিয়ন্ত্রণ ও ভাঙনশক্তিই এই রচনাকর্মে মুখ্য হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গত মানবিক কর্ম—প্রক্রিয়ারূপে শিল্পসৃষ্টির বিকাশ ঘটে। অবশ্য এই ব্যক্তির সঙ্গে ইতিহাসের ও সংস্কৃতির বিকশিত রূপটির অভিজ্ঞান জড়িত থাকে।

৩. ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ ও সারাৎসারই সভ্যতার ইতিহাস গড়েছে। শিল্পরচনায় যেহেতু ব্যক্তিস্বরূপই আরাধ্য, সেহেতু বর্তমান জীবনব্যবস্থাধীন ব্যক্তিত্বের খণ্ডিত রূপকে মনুষ্যত্বের পূর্ণতায় উত্তীর্ণ করাই মূল লক্ষ্য।[৭৫] তাই ব্রাত্যদের সাহিত্যে আগমনকে তিনি ব্যক্তির আগমন হিসেবেই দেখেন, কোন অস্তিত্বহীন সংঘের অংশ হিসেবে নয়।

৪. এই নন্দনতত্ত্বে প্রেরণাবাদ অস্বীকৃত; শ্রম, বিজ্ঞানদৃষ্টি ও মননচর্চার দ্বারা কঠিনতায় সাধ্য। জীবনের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির সঙ্গে যেমন লেখা হয়ে ওঠে মহৎ ও নৈর্ব্যক্তিক, তেমনি নৈর্ব্যক্তিক পরিমিতি আসে মানবধর্মীর হৃদয়বত্তা থেকে, অর্থাৎ আত্মসচেতন মনোবিশ্বই প্রাথমিক।

৫. সে-অর্থে তাঁর নন্দনতত্ত্ব কাব্যকে গ্রহণ করে 'আগ্নসচেতন মনের কাব্যিক স্বাক্ষর' রূপে। আধুনিকতা মাত্রেই এই আত্মসচেতন "মনেরই সজ্ঞানতার স্বয়ংনির্দিষ্ট সক্রিয় বিন্যাস কারণ এই মন চায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের পরে ভাষার প্রবহমান রূপ, তার নিজেরই প্রতিধ্বনি।"[৭৬]

৬. কবিতায় দৈশিকতা বিধৃত হবে প্রাকৃতিক স্বরূপে রূপায়িত মানুষের জীবনছন্দের নকশায়। বিষ্ণু দের নন্দনতত্ত্বে স্থানিকতা মানুষের জীবনযাত্রার মূলরূপের ভিতের সঙ্গে এক ধরনের অন্তঃশীল-সম্বন্ধে বিজড়িত থাকে। আর কালের প্রশ্নে তিনি খণ্ডিত, স্মরণীয় মুহূর্তের রূপমূর্তিকে আঁকেন স্থিরত্বে নয়, ঘূর্ণায়মান চক্রে, প্রগতির লক্ষ্যে ধাবমানতার চাঞ্চল্যে। ফলে একই সঙ্গে বর্ণিল রেখা ও ছন্দের গতিময়তা স্পন্দমান হয়। এ-সূত্রেই চিত্রকলা ও সঙ্গীত কবিতার অন্তর্বয়নে যথাযোগ্য হয়ে ওঠে।

৭. আবার উক্ত তাৎপর্যেই বিষ্ণু দে কবিতার গঠনকে ধারণ করেন দ্বন্দ্বময় অলঙ্কৃতির পরিকাঠামোর মধ্যে, আধুনিক মনে যদিও বিচ্ছিন্নতাবোধ তীব্র, তীর্যক, তাই এই-মনের কবিতাও হবে ব্যাখ্যার বদলে ব্যঞ্জনাধর্মী, রূপকীকৃত না হয়ে প্রতীকী এবং সুবোধ্যতা-বিচ্যুত হয়ে জঙ্গম, উচ্চাবচ, কখনও-বা দুর্বোধ্য।

তথ্য-নির্দেশ

১ *তরী হতে তীর*, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা, ২য় প্রকাশ— ১লা মে ১৯৮৬ দ্রষ্টব্য।

২ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ঐ, পৃ ২৫৩-৫৫

৩ অরুণ সেন, *এই মৈত্রী! এই মনান্তর*, আশা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মহালয়া ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ, পৃ ৩৬

৪ দ্রষ্টব্য, বিষ্ণু দের ভাষ্য, *In the Sun and the Rain* গ্রন্থের উৎসর্গপত্র- "I dedicate this book to two of my very good friends for three decades and a half— P.C. Joshi and Hirendranath Mukherjee.....and thereby bypass my own diffidence." প্রথম প্রকাশ মার্চ ১৯৭২, People's Publishing House, New Delhi.

৫ সাম্যবাদী চেতনা ও শিল্পীসত্তার সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই আলোচনার ভিত্তি হচ্ছে Cristopher Caudwell-এর *Illusion and Reality* গ্রন্থের The Future of Poetry শীর্ষক অধ্যায়। দ্রষ্টব্য— ঐ নামের গ্রন্থ (১৯৩৭), London, reprint 1958, page No. 271

৬ বিষ্ণু দে, "সাহিত্যে সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল," (প্রবন্ধ), *সেকাল থেকে একাল*, কলকাতা ১৯৮০, পৃ ১৯

৭ মার্কসীয় দর্শনের এই মানবতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রসঙ্গের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য দৃষ্টব্য খ্যাতনামা অধ্যাপক-দার্শনিক Adam Schaff এর গ্রন্থদ্বয়, *A philosophy of Man*, Lawrence

and Wishart, London 1963 এবং *Marxism of the Human Individual,* Megraw Hill Book.Co. 1970.

৮ দ্রষ্টব্য, Adrono's Essay 'Commitment' in *Aesthetics and Politics,* New Left Books, London 1977.

৯ বিষ্ণু দে, 'সাহিত্যে সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল'', পূর্বোক্ত, পৃ ১২

১০ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিষ্ণু দে: কালে, কালোত্তরে,* কলকাতা, আগষ্ট ১৯৮২, পৃ ৭১

১১ বিষ্ণু দে, *সেকাল থেকে একাল,* পূর্বোক্ত, পৃ ১৩

১২ বিষ্ণু দে, "জনৈক লেখকের কৈফিয়ত", *সেকাল থেকে একাল,* পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

১৩ দ্রষ্টব্য— Partha Chatterjee, *Bengal 1920-1947,* ১৯৮৪, পৃ ১৭৯-১৮০

১৪ দ্রষ্টব্য, "টি. এস. এলিয়টের মহাপ্রস্থান", (প্রবন্ধ), *জনসাধারণের রুচি,* বিশ্ববাণী, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ১৬৫-৬৬

১৫ T.S. Eliot, "Tradition and the Individual Talent", selected Essays, Faber and Faber, London 1934,' Page No. 14

১৬ প্রসঙ্গত দ্রষ্টব্য তাঁর প্রবন্ধাবলী, যেমন "ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত," "বীরবল থেকে পরশুরাম," "বাংলা সাহিত্যের ধারা," "বাংলায় শিল্পচর্চা" ইত্যাদি। গ্রন্থ *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ* ১৩৫৯, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

১৭ লুকাচের মতাদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাখ্যার জন্য দ্রষ্টব্য, তাঁর রচিত *Theory of Aestheties,* 1963, এবং *Studies in European Realism,* ১৯৫০ গ্রন্থদ্বয়। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য, *Lucas, Writer and Critic and Other Essays,* edited by Arthur Kahn, London, 1970.

১৮ থিয়োডোর এডরনোর তাত্ত্বিকতার ভিত্তিতে বিষ্ণু দের কবিতাকে একটি পদ্ধতিগত কাঠামোর মধ্যে ব্যাখ্যা করেছেন শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর গবেষণাগ্রন্থ *Dialectics and Dream* গ্রন্থে, Stuttgart, 1987.

১৯ দ্রষ্টব্য Adrono's essay 'Commitment' in *Aesthetics and Politics*, New Left Books, London, 1977.

২০ ক্ষেত্রগুলো সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে শুভরঞ্জন দাশগুপ্তের *Dialectics and Dream*, Stuttgart, 1987, page No. 106-113

২১ বিষ্ণু দের গ্রন্থ *সেকাল থেকে একাল* দ্রষ্টব্য, পূর্বোক্ত, পৃ ১৪

২২ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র, "—পার্থকে বোলো তো– John M. Commett-এর বই–এর নামটি। নাম: *Antinio Gramsci and the Origins of Italian Communism*, (Stanford University press)"। দ্রষ্টব্য, *'এবং এই সময়'* (ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা, বিষ্ণু দে সংখ্যা), ফাল্গুন ১৩৯৬, পৃ ১৫

২৩ Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith সম্পাদিত গ্রন্থ *Selections From the Prison Notebooks* দ্রষ্টব্য, London, 1971.

২৪ ঐ, পৃ ৩৩৪

২৫ Marx and Literature in Bengal নামে P.C.Joshi সম্পাদিত *Homage to Karl Marx* রচনাসংকলনে PPH, ডিসেম্বর ১৯৬৯ সংখ্যায় প্রকাশিত। Marx and Bengali Writing নামে *In the Sun and the Rain* গ্রন্থে সংকলিত, রচনাটির বর্ধিত বাংলা অনুবাদ হচ্ছে "সাহিত্যে সেকাল থেকে মার্কসীয় কাল" প্রবন্ধটি, দ্রষ্টব্য *'সেকাল থেকে একাল'*, পূর্বোক্ত।

২৬ 'সমুদ্রের মৌন' ফরাসী লেখক ভেরকর (Vercors)–এর *Le Silence de la Mer* নামক ফ্যাসিবিরোধী গল্পের অনুবাদ– 'মূল ফরাসী থেকে', গল্পটি গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে, ভূমিকায় 'ফরাসী প্রতিরোধ ও সাহিত্য' শিরোনামে বিষ্ণু দের একটি আলোচনা রয়েছে।

২৭ "নির্বাহ" প্রকাশিত হয় 'অভ্যুদয়' পত্রিকায়, সংখ্যা অজ্ঞাত, ১৯৪৫(?), পুর্ণমুদ্রণ 'প্রেসিডেন্সী কলেজ পত্রিকা', ডিসেম্বর ১৯৭৩।

২৮ "শিল্পীদের দায়িত্ব" (চিঠি),' 'অরণি', ৩১-এ জুলাই ১৯৪২ সাল; "প্রগতিবাদী কবি" (পুস্তক সমালোচনা), 'পরিচয়', অগ্রহায়ণ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ; "Notes on Progressive Writing in Bengal" (প্রবন্ধ), হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'US- people's Symposium পত্রিকার সংকলনে প্রকাশিত; প্রকাশকাল ১৯৪২(?); "কেন লিখি?" (প্রবন্ধ), প্রকাশকাল জানুয়ারী ১৯৪৪ সাল, ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রকাশিত ঐ নামেরই রচনা-সংগ্রহ।

২৯ তথ্যের উৎস, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "পুনরুজ্জীবনের অভিনয়", 'বহুরূপী,' নবান্ন-স্মারক সংখ্যা, ২রা জুন ১৯৭০। এই আলোচনায় বিষ্ণু দের নাট্য-প্রযোজনা ও পরিচালনার ধরন সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে।

৩০ বিষ্ণু দে, "জনৈক লেখকের কৈফিয়ত", পূর্বোক্ত, পৃ ২৫

৩১ এলুয়ার ও আরাগঁ-র কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয় 'পরিচয়', শ্রাবণ ১৩৫১ সংখ্যায়। কবিতাগুলো *সাত ভাই চম্পা* গ্রন্থে (১৯৪৫) এবং পরে অনুবাদ কবিতা গ্রন্থ হে বিদেশী ফুল (১৯৫৬)-এ গৃহীত হয়।

৩২ অরুণ সেন, *এই মৈত্রী! এই মনান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬

৩৩ দেবেশ রায়, "চৈতন্যের সহোদর: পরিচয় ও বিষ্ণু দে" (প্রবন্ধ), 'পরিচয়', ৪৮ বর্ষ ১০-১২ সংখ্যা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ ১২

৩৪ সৈয়দ আলী আহসান, *আধুনিক বাংলা কবিতা: শব্দের অনুষঙ্গে*, ঢাকা ১৯৭০, পৃ ৮৪

৩৫ অরুণ সেন, *এই মৈত্রী ! এই মনান্তর*, পূর্বোক্ত, পৃ ১৫

৩৬ বিষ্ণু দের Sudhindranath Dutta/Review of Swagata নামক সমালোচনাটি progressive Literature Quarterly-তে প্রকাশিত হয়েছিল সম্ভবত ১৯৩৯ সালে। অরুণ সেন বিষ্ণু দের পাণ্ডুলিপির খসড়া থেকে এটির অনুবাদ করেন 'সুধীন্দ্রনাথ ও স্বগত" নামে, ছাপা হয় 'অনুক্ত' পত্রিকার বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৮৫ সংখ্যায়।

৩৭ এই যোগাযোগের প্রমাণ বিষ্ণু দের কাছে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র, দ্রষ্টব্য, অরুণ সেনের *এই মৈত্রী! এই মনান্তর,* গ্রন্থের চিঠিপত্র অংশ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫

৩৮ তথ্য, অমলেন্দু দে, "ভারতের জাতীয়তাবাদী-বিপ্লবী আন্দোলন (১৮৭৬-১৯৪৭)", 'চতুরঙ্গ', মার্চ-১৯৮৬ সংখ্যা, পৃ.৮৯৭-৯০০।

৩৯ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত '*মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক* গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ভূমিকাংশ, ১ম প্রকাশ জুন ১৯৭৫, পৃ সাত।

৪০ এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের অধিবেশন মণ্ডপে। সূচনাতে এটি ছিল 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ' (A.I.P.W.A.)। ১৯৩৬ সালেই বাংলায় এর শাখা গঠিত হয় এবং ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে তা 'ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘে' রূপান্তরিত হয়। তথ্য, চিন্মোহন সেহানবীশ, *একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে,* পৃ ১৫৮-৫৯

৪১ ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত *মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক,* পূর্বোক্ত, পৃ ৪২

৪২ "জনযুদ্ধ" (পত্রিকা), ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৪৪ সাল। রিপোর্টের শিরোনাম "শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সংস্কৃতি উৎসব।"

৪৩ সাধন দাশগুপ্ত, "পূর্ব বাঙলার গণশিল্পী", কমিউনিস্ট পার্টির অর্ধশতক পূর্তি স্মারকপত্র, ১৯৭৬।

৪৪ দ্রষ্টব্য, ১৯৪২-এর মার্চে প্রকাশিত 'প্রাচীর' কাব্য-সংকলন, ১৯৪২-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত 'একসূত্রে' কাব্য-সংকলন কিংবা ১৯৪২-এর জুলাইয়ে প্রকাশিত 'জনযুদ্ধের গান' নামক গীতি-সংকলন।

৪৫ প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হয়েছে টীকা নং ২৮-এ।

৪৬ বিনয় ঘোষ, *নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা,* ১ম অরুণা সংস্করণ ১৯৮১, পৃ ১১৮

৪৭ ঐ, পৃ ১১৮

৪৮ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, *তরী হতে তীর,* পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪৭

৪৯ ঐ, পৃ ২৯৯

৫০ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, "চৈতন্যের সর্বাঙ্গে গভীর মুক্তিস্নান", *'এবং এই সময়'* (ত্রৈমাসিক পত্রিকা), বিষ্ণু দে সংখ্যা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ফাল্গুন ১৩৯৬।

৫১ বিষ্ণু দে, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প–সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা,* জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ ৩২

৫২ তথ্যের উৎস আর. এইচ. ষ্টেসী প্রণীত *Russian Literary Criticism; A Short History,* Syracuse, 1974, Page No. 154

৫৩ নীহার দাশগুপ্ত, "পাঠক গোষ্ঠি" (কলাম), 'পরিচয়', মাঘ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

৫৪ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, "পাঠক গোষ্ঠি" (কলাম), পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ।

৫৫ প্রদ্যোৎ গুহ, "বাংলা প্রগতি–সাহিত্যের আত্মসমালোচনা" (প্রবন্ধ), সংকলিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য–বিতর্ক', পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭

৫৬ ধনঞ্জয় দাশ, 'মার্কসবাদী সাহিত্য–বিতর্ক', পূর্বোক্ত, পৃ পঁচাশি।

৫৭ বিষ্ণু দের পদত্যাগের ইচ্ছা–বিষয়ক চিঠির বক্তব্য–বিশেষ। চিঠিটি ছাপা হয় নি। এ তথ্যের সূত্র, অরুণ সেনের "বিষ্ণু দের রচনাপঞ্জি", পূর্বোক্ত, পৃ ৩১

৫৮ চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, দ্রষ্টব্য, *'এবং এই সময়,'* পূর্বোক্ত, পৃ ৯৫

৫৯ দ্রষ্টব্য ত্রিবিদ চৌধুরী রচিত "সাহিত্য বিচারে মার্কসবাদ" প্রবন্ধ, 'ক্রান্তির' ১৩৫৫ বঙ্গাব্দের শারদীয় সংখ্যা।

৬০ এই সমালোচনাটি "রাজায় রাজায়" নামে *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ* গ্রন্থে মুদ্রিত হয়।

৬১ প্রকাশিত হয় "মার্কসবাদী" পত্রিকার ১ম সংকলনে, অক্টোবর ১৯৪৮।

৬২ ঐ।

৬৩ ভবানী সেন, "বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি ধারা", মার্কসবাদী সংকলন ১৯৪৮, ১ম সংখ্যা। পরে মুদ্রিত হয় 'মার্কসবাদী সাহিত্য–বিতর্ক' গ্রন্থে, পূর্বোক্ত, পৃ ২০

৬৪ প্রদ্যোৎ গুহ, "সাহিত্য বিচারের মার্কসীয় পদ্ধতি", ঐ, পৃ ২৯

৬৫ আশীষ বর্মণের স্মৃতিচারণ, "বিষ্ণু দে: ব্যক্তিগত স্মৃতি", *'এবং এই সময়'*, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৮। প্রদ্যোৎ গুহও তাঁর মত পরিবর্তন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, "মার্কসীয় সাহিত্য-সমালোচনার সমস্যা," (১৯৭৩)।

৬৬ মার্কস সাহিত্যের বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে যেসব মন্তব্য করেছেন তার ভিত্তিতেই মার্কসীয় নন্দনতত্ত্বের ব্যাখ্যা গড়ে উঠেছে। এসব মতামত সংকলিত হয়েছে *Marx Engles: On Literature and Art* গ্রন্থে, ১৯৭৬ সাল, মস্কোর প্রগ্রেস পাবলিশার্স কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

৬৭ বিষ্ণু দে, "আরাগঁ," *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ*, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৯-৭০। প্রবন্ধটি মূলে ইংরেজীতে "The poetry of Louis Aragon" নামে The people, 8th May 1949 সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এটির বাংলা অনুবাদ, "একটি বিকাশের ধারা: আরাগঁ", 'সাহিত্য-পত্র', মাঘ ১৩৫৬-তে ছাপা হয়। পরে গ্রন্থভুক্ত হয়।

৬৮ বিষ্ণু দে, ঐ, পৃ ৭১

৬৯ বিষ্ণু দে, "রাজায় রাজায়", পূর্বোক্ত, পৃ ৬২

৭০ দ্রষ্টব্য— 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক", ৩য় খণ্ডের ভূমিকাংশ, ১৯৭৬, পৃ একুশ, তিপ্পান্ন।

৭১ অরবিন্দ পোদ্দার, 'মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার', জুলাই ১৯৮৫, উচ্চারণ, কলকাতা, পৃ ১৭৫

৭২ আবু সয়ীদ আইয়ুব, "Quest", July-Sept, 1960.

৭৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, "বিষ্ণু দে: নবজগতের নির্মাণে", *আধুনিক বাংলা কবিতা: প্রাসঙ্গিকতা ও পরিপ্রেক্ষিত*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ ১৭৫

৭৪ বিষ্ণু দে: কালে, কালোত্তরে, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮

৭৫ বিষ্ণু দের *সাহিত্যের ভবিষ্যৎ* গ্রন্থ দ্রষ্টব্য, পৃ ৪২

৭৬ বিষ্ণু দে, *রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প-সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা*, পূর্বোক্ত, পৃ ৪